মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও

লোকজ উৎসব

২০০৯

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৯

১৫ ফাল্গুন ১৪১৫/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ - ১৪ চৈত্র ১৪১৫/২৮ মার্চ ২০০৯

স্মরণিকা

বাঙালি জাতির লোক সংস্কৃতির মূল দ্যোতনাই সৃষ্টি
করেছে আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্প

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৯

Folk Art & Crafts Fair and Folk Festival 2009

সম্পাদক
শেখ আলাউদ্দিন
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

সহকারী সম্পাদক
ড. বিশ্বনাথ সরকার
গবেষণা অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

মোঃ রবিউল ইসলাম
সংরক্ষণ অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রচ্ছদ
একেএম আজাদ সরকার
প্রদর্শন অফিসার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

সহযোগিতা
একেএম মুজ্জাম্মিল হক
গাইড লেকচারার
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

ফটোগ্রাফি
শফিকুর রহমান
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

প্রকাশক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

মুদ্রণ
নাজ এন্টারপ্রাইজ
৭৭, আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৫ ফাল্গুন ১৪১৫
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

বাণী

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিবছরের ন্যায় এবারও মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমাদের সংস্কৃতির এক অকৃত্রিম উৎস হল লোক ও কারুশিল্প। গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে, আমাদের ঐতিহ্যের পরতে পরতে যাঁদের অবদান, সেই লোক ও কারুশিল্পীদেরকে আমাদের মূল্যায়ন করতে হবে। কারুশিল্পীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগানোর মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্প যে তার স্বমহিমায় ফিরে আসতে পারে, এ সত্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সংগ্রামী অভিজ্ঞতা থেকে অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। সে জন্যেই তিনি বঙ্গ ঐতিহ্যের পাদপীঠ বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও-এ বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তার সে উদ্যোগ বাস্তবায়নে এগিয়ে এসেছিলেন আমাদের চারু ও কারুশিল্পের এক প্রবাদ পুরুষ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনর্জাগরণ ঘটানোই ছিল এ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আমাদের লোক ও কারুশিল্প বিকাশে এর আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুক - এ প্রত্যাশা সকলের।

আমি লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

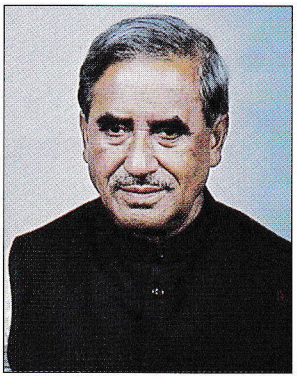

আবুল কালাম আজাদ
মন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

গ্রাম বাংলার সামাজিক ঐতিহ্য, কৃষ্টি, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতিই বাঙালির লোকসংস্কৃতি। আমাদের লোকসংস্কৃতি অন্য সকল জাতি থেকে স্বতন্ত্র। লোক ও কারুশিল্প আমাদের অকৃত্রিম সংস্কৃতির ভাণ্ডারের প্রধান উপাদান।

আঘাত, বঞ্চনা ভরা কঠিন দিনগুলোতে লোকসংস্কৃতি আমাদের শক্তি যুগিয়েছে, অনুপ্রেরণা দিয়েছে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথার্থই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন সংস্কৃতির মূল ধারাকে বাঁচাতে হলে, শত আঘাত ও বিকৃতি থেকে একে রক্ষা করতে হলে আমাদের লোকশিল্প, আমাদের কারুশিল্পকে বাঁচাতে হবে ও এর পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে। তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ শিল্পের চর্চার জন্য একটি উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। ইতিহাসের বহু ঘটনার সাক্ষী ঐতিহ্যবাহী সোনারগাঁও-এর নিভৃত পরিবেশকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন যথার্থভাবেই জাতির জনকের ইচ্ছাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের ইতিহাসকে ধারণ, লালন, বিকাশ এবং লোক ও কারুশিল্পীদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে আরো গতিশীল এবং কর্মকাণ্ড আরো বিস্তৃত করার প্রয়োজন মনে করছি।

মেলাপ্রিয় বাঙালি যুগ যুগ ধরে মেলার মাঝে পণ্য বিপণনের আনন্দ ও উৎসবের আমেজ খুঁজেছে। গ্রামীণ মানুষের উৎপাদিত পণ্যের বাজার বসেছে গাছের নীচে, উন্মুক্ত মাঠে। এভাবেই তারা নিজেদের পণ্যের বাজার নিজেরাই সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সে মেলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছে লোকজ উৎসবের মাধ্যমে।

প্রতি বছরের মতো এবারেও লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবকে আরো বিস্তৃত করতে হবে। সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। এ ধরনের মহৎ উদ্যোগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সবসময়ই পাশে থাকবে।

আমি লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৯ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(আবুল কালাম আজাদ)

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

বাঙালির জীবন ধারার হৃদস্পন্দন হচ্ছে লোকসংস্কৃতি। এর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার মানুষের কর্মকুশলতা ও শিল্প নৈপুণ্য ফুটে উঠেছে। একদা সোনারগাঁও ছিল বাংলার বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রধান পাদপীঠ। সোনারগাঁও এর মসলিন ও জামদানির খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। মোগল সম্রাটরা মসলিনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সম্রাজ্ঞীরা ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার করতেন মসলিন।

২০০ বছরের অধিককাল ধরে স্বাধীন সুলতানদের রাজধানীও ছিল সোনারগাঁও। তাদের আনুকূল্যে এলাকাটি জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। আজ এসব ঐতিহ্যের অনেক কিছুই অবলুপ্ত হয়েছে। ইতিহাস খ্যাত এ সোনারগাঁও এ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। এর প্রতিষ্ঠার পিছনে কাজ করেছিলেন, অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি তার শেকড়ের সন্ধানে উৎসাহী হোক, হারানো ঐতিহ্যের ভিত্তিভূমি নতুন প্রজন্মে খুঁজে পাক, বাঙালি তার সংস্কৃতির সামগ্রিক ধারা থেকে বিচ্যুৎ না হোক, বাংলার লোক ও বৈচিত্র্যময় কারুশিল্প তার পুনরুজ্জীবন পাক। এ লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে প্রতি বছরের মতো এ বছরও উদযাপিত হচ্ছে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৯ এবং এ উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশা করছি এ মেলা ও উৎসব আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোক সংস্কৃতিকে সকলের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

আমি লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৯ এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

(আব্দুল্লাহ-আল-কায়সার)
সংসদ-সদস্য
২০৬ নারায়ণগঞ্জ-৩

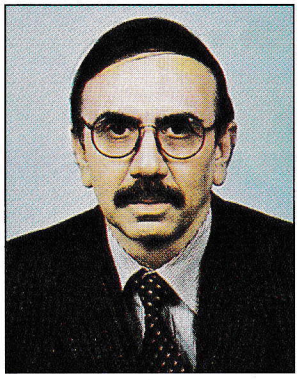

সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে জীবনধারাকে গড়ে তুলেছেন। তারা উৎপাদন কৌশলের উন্মেষ ঘটিয়েছেন; অর্জন করেছেন শিল্প সৃষ্টির নিপুণ দক্ষতা। এদেশের মানুষ বয়ন করেছেন সূক্ষ্ম মসলিন ও জামদানি। তৈরি করেছেন চিত্রিত ঘোড়া ও হাতিসহ অন্যান্য কারুপণ্য। নারীরা নকশি কাঁথার কারুকাজের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁদের অন্তর্গত সৌন্দর্য চেতনা। গ্রামীণ জনগণের এসব সৃষ্টি কর্মের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে লোক সংস্কৃতির ধারা। দেশের মানুষ তাঁদের কাজের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বিনোদনের উপাদান। তাঁরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির জন্য আয়োজন করেছেন মেলার। বিভিন্ন উৎসব, পার্বণ উপলক্ষে বসেছে এসব মেলা।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-২০০৯' এর আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উদ্যোগ লোক সংস্কৃতির উজ্জীবনে দেশ ও জাতির জন্য অর্থবহ ফল বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস। মেলা ও উৎসব উপলক্ষে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব সফল করার লক্ষ্যে যারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের প্রতি রইল আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি 'লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব-২০০৯' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ শরফুল আলম)
সচিব

পরিচালক
বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন

পরিচালকের বক্তব্য

দৈনন্দিন গ্রামীণ জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এককালে লোক ও কারুশিল্পের ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। যন্ত্রের বিকাশ ও ব্যবহার সে আধিপত্যের অবসান ঘটালেও গ্রাম বাংলার প্রতিটি ঘরে এখনও এ শিল্পের অনেক পণ্য সৌন্দর্য বর্ধন বা নিত্য ব্যবহারের জন্য শোভা পাচ্ছে। কারুপণ্য নগরকেন্দ্রিক মানুষের বৈঠকখানার সাজসজ্জার একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দিয়েছে। দেশের সীমানা পেরিয়ে এর বিস্তৃতি সব মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। একই কথা বলা যায় আমাদের বিপুল ঐশ্বর্যময় লোক সঙ্গীত সম্পর্কে। মূলত: সৌন্দর্যবোধ, শিল্পবোধ কখনও পুরনো হয় না। শিল্প (Art)-এর জন্য শিল্প এবং মানুষের জন্য শিল্প বেঁচে থাকবেই। লোক ও কারুশিল্প বাঙালির সংস্কৃতির প্রধান উৎস। দেশজ সংস্কৃতির ঐশ্বর্যময় প্রভাব বাঙালির মানস গঠনে ও বিকাশে বিপুলভাবে কাজ করেছে। এ উৎস-ধারা শত শত বছর ধরে আমাদের সংস্কৃতির মূল শেকড়ে জলসিঞ্চন করে আসছে। দেশীয় সঙ্গীতের সুর, ভাব, কথা বাঙালির অসাম্প্রদায়িক মানস গঠনে, চেতনা বিকাশে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

এগ্রিকালচার ও কালচার দু'টিরই সমান গুরুত্ব রয়েছে। সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ছাড়া দেশ সমৃদ্ধ হয় না,–প্রকৃতভাবে সভ্য হওয়া যায় না,- অসাম্প্রদায়িক মানুষ হওয়া সম্ভব নয়– এ সত্য অনুধাবনের সময় এসেছে।

এ প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে ৩৪টি বসন্ত অতিক্রম করেছে। এখানকার উৎসব ও মেলা মূলত: লোক ও কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের সুবিশাল সাগরে চেতনার তরী ভেড়ানোর, স্মৃতির রথ নামানের এক প্রাণময় প্রয়াস। বটতলায়, হাটখোলায় প্রাচীন মেলার আমেজ পরিপূর্ণভাবে না পাওয়া গেলেও মানুষে মানুষে মিলনের এক মোহনায় সমবেত হবার একটি আবহ এখানে সৃষ্টি হয়। মেলায় মিলবে কোন ধর্মের, বর্ণের, সম্প্রদায়ের মানুষ নয়; সেখানে সব 'মেলার মানুষ' এ পরিচয়টি আবারো অনুভূত হয়। এ মেলার লোক ও কারুপণ্য এবং তার শিল্প কৌশল চিরায়ত বাংলার লোক জীবনকে জীবন্ত করে তুলে ধরে।

কারুশিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য দেশের ঢাকা, নারায়ণগঞ্জসহ অনেক জেলার কারুশিল্পী এবার মেলায় তাদের পণ্য উৎপাদন করবেন এবং এখানে তারা এ পণ্য বিপণনের সুবিধা পাবেন। নতুন কারুশিল্পীগণ এর থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবেন, কারুশিল্পের বাজারও সম্প্রসারিত হবে। মেলায় ১৮০টিরও বেশি স্টলে বিভিন্ন রকমের পণ্যের সমারোহ ঘটবে। আর অগণিত লোকশিল্পীরা এবার মেলায় আমাদের ভক্তি, বিশ্বাস, ভাব, বোধ তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অপূর্ব সুর মূর্চ্ছনায় শ্রুতি গ্রাহ্য করবেন। মূলত: বাংলার চিরায়ত রূপের এক অকৃত্রিম জীবনধারা এখানে দৃশ্যমান হবে। এ মেলা ও লোকজ উৎসব দেশীয় সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে সাধারণ মানুষের সেতুবন্ধন রচনা করতে সক্ষম হবে। এ মেলা লোক সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সনাক্ত করা ও আমাদের জাতীয়তাবোধের শেকড় খুঁজে পেতে বিশেষ করে নব প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দেবে।

বাঙালির আত্মপরিচয় শত ঘাত প্রতিঘাতেও অটুট আছে। এ পরিচয় বিশ্বের দরবারে আরো ছড়িয়ে দিতে হবে। দিন বদলের এ সূচিত পালায় তাই নতুনদেরই এগিয়ে আসতে হবে।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ফাউন্ডেশনকে যারা সহায়তা দিয়েছেন-বিশেষ করে স্থানীয় জনসাধারণ যেভাবে এটিকে ভালোবেসে এর অগ্রগতি ও কলেবর বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এবারের লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজনে যারা শ্রম মেধা ও সহযোগিতা দিয়েছেন তাঁদেরকে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ও ভবিষ্যতে অনুরূপ সহযোগিতা কামনা করছি।

(শেখ আলাউদ্দিন)

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন
১৯৭৫-২০০৯ : তথ্যাবলী

১। **স্থাপিত :** ১২ মার্চ ১৯৭৫ তারিখে এক প্রজ্ঞাপন বলে সরকার নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে।

২। **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :** বাংলাদেশের লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শনাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন।

৩। **অবস্থান :** নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলায়, রাজধানী ঢাকা থেকে ২৫ কিলোমিটার পূর্বে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে ২ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত।

৪। **ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পর গঠিত প্রথম পরিচালনা বোর্ড :**

১)	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	সভাপতি
২)	সচিব, শ্রম, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩)	অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	”
৪)	চেয়ারম্যান, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা	”
৫)	পরিচালক, ঢাকা জাদুঘর	”
৬)	অধ্যক্ষ, চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়	”
৭)	জনাব শওকত আলী খান, সংসদ সদস্য	”
৮)	বেগম আজরা আলী, সংসদ সদস্য	”
৯)	জনাব এ কে নাজমুল করিম, চেয়ারম্যান সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	”
১০)	জনাব মীর মোস্তফা আলী	”
১১)	জনাব এম, এ জামান, সোনারগাঁও	”
১২)	জনাব সফিকুল আমীন নির্বাহী পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	”

৫। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন ১৯৯৮ সালে মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং গত ৬ মে ১৯৯৮ তারিখে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হয়।

৬। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আইন, ১৯৯৮ অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

১) ঐতিহাসিক লোক ও কারুশিল্প সংরক্ষণ করা;
২) কারুশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৩) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা;
৪) নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত সোনারগাঁয়ে একটি শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা;
৫) লোক ও কারুশিল্প বিষয়ে গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ তত্ত্ব ও তথ্যাদির প্রকাশনার ব্যবস্থা করা;
৬) লোক ও কারুশিল্পের নিদর্শনাদির সংরক্ষণ এবং ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের উৎসাহ দান;
৭) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৮) লোক ও কারুশিল্পের গবেষণায় নিয়োজিত যে কোনো ব্যক্তি ও সংস্থাকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা;
৯) লোক ও কারুশিল্প উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে সাহায্য করা এবং তৎসম্পর্কিত যে কোনো বিষয়ে সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ প্রদান;
১০) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে দেশী, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একই বিষয়ে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করা;
১১) উপরে উল্লিখিত কার্যাদির সম্পূরক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য কার্য করা।

৭। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের সভাপতিগণের নামের তালিকা ও সময়কাল :

	নাম	সময়কাল
১)	শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	০১/০৬/৭৫ - ১২/০৫/৭৬
২)	প্রফেসর এ কে নাজমুল করিম	১৩/০৫/৭৬ - ১৭/০৯/৭৮
৩)	জনাব এ বি এম সফদার	১৮/০৯/৭৮ - ২১/১১/৭৮
৪)	জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান	২২/১১/৭৮ - ২১/১০/৮১
৫)	জনাব হেদায়েত আহম্মদ	২২/১০/৮১ - ১৩/০৫/৮২
৬)	জনাব মঞ্জুর মোর্শেদ	১৪/০৫/৮২ - ১৪/০৫/৮৪
৭)	জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী	১৫/০৫/৮৪ - ১৫/০৮/৮৬
৮)	জনাব মোমেন উদ্দিন আহাম্মদ	১৬/০৮/৮৬ - ০৫/১২/৮৬
৯)	জনাব মাহবুব রহমান	০৬/১২/৮৬ - ০৭/০৭/৮৮
১০)	জনাব নূর মোহাম্মদ খান	০৮/০৭/৮৮ - ১৯/০৬/৮৯
১১)	সৈয়দ দীদার বখত	২০/০৬/৮৯ - ২৭/০১/৯১
১২)	অধ্যাপক ইয়াজ উদ্দিন আহম্মেদ	২৮/০১/৯১ - ২৮/০৭/৯২
১৩)	অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম	২৯/০৭/৯২ - ৩০/০৩/৯৬
১৪)	অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক	০৩/০৪/৯৬ - ২৩/০৬/৯৬
১৫)	জনাব ওবায়দুল কাদের	২৩/০৬/৯৬ - ১৫/০৯/০১
১৬)	বেগম রোকেয়া এ রহমান	১৬/০৯/০১ - ০৯/১০/০১
১৭)	বেগম সেলিমা রহমান	১০/১০/০১ - ৩০/১০/০৬
১৮)	জনাব সি এম শফি সামি	০১/১১/০৬ - ১১/১২/০৬
১৯)	জনাব সফিকুল হক চৌধুরী	১২/১২/০৬ - ১১/০১/০৭
২০)	জনাব আইয়ুব কাদরী	১৭/০১/০৭ - ২৩/১২/০৭
২১)	বেগম রাশেদা কে চৌধুরী	২১/০১/০৮ - ০৫/০১/০৯
২২)	জনাব আবুল কালাম আজাদ	০৬/০১/০৯ -

৮। **বর্তমান পরিচালনা বোর্ড**

১)	জনাব আবুল কালাম আজাদ মন্ত্রী সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২)	জনাব মোঃ শরফুল আলম সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
৩)	জনাব সমর চন্দ্র পাল মহাপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর	সদস্য
৪)	যুগ্ম সচিব অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য

৫)	ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ মহাপরিচালক বাংলা একাডেমী	সদস্য
৬)	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা	সদস্য
৭)	জনাব শফিক আলম মেহেদী চেয়ারম্যান বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, তেজগাঁও, ঢাকা	সদস্য
৮)	জনাব এ এম এম রহমান জেলা প্রশাসক নারায়ণগঞ্জ।	সদস্য
৯)	ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ সরকারি জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।	সদস্য
১০)	জনাব মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন প্রাক্তন সচিব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	সদস্য
১১)	জনাব মুনিরুল ইসলাম উপ-সচিব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২)	ড. হাবিবা খাতুন অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।	সদস্য
১৩)	পরিচালক চারুকলা ইনস্টিটিউট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা।	সদস্য
১৪)	জনাব শেখ আলাউদ্দিন পরিচালক বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন	সদস্য-সচিব

৯। ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ

১)	জনাব সফিকুল আমীন	২৪/১১/৭৫	- ৩১/০৭/৮২
২)	ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান	০১/০৮/৮২	- ০২/১২/৮৩
৩)	সৈয়দ মাহবুব আলম (চলতি দায়িত্ব)	০৩/১২/৮৩	- ০৮/০৫/৮৪

১০। ফাউন্ডেশনের পরিচালকবৃন্দ

১)	জনাব মুহ: নুরুন্নবী	০৯/০৫/৮৪	- ১৮/০৭/৮৪
২)	সৈয়দ মাহবুব আলম (চলতি দায়িত্ব)	১৯/০৭/৮৪	- ০১/১০/৮৪
৩)	জনাব এম. এ রশিদ	০২/১০/৮৪	- ১০/০১/৮৭
৪)	জনাব এস.কে.এম শামসুল হক	১১/০১/৮৪	- ১৪/০৭/৯১
৫)	জনাব কে. এম. হাবিব উল্লাহ	১৫/০৭/৯১	- ০৬/০৭/৯৩
৬)	জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া	০৭/০৭/৯৩	- ২১/০৯/৯৭
৭)	জনাব আ ন ম আবদুল্লাহ	২২/০৯/৯৭	- ১৯/০২/৯৮
৮)	সৈয়দ মাহবুব আলম (চলতি দায়িত্ব)	২০/০২/৯৮	- ০৭/১০/০২
৯)	জনাব ছোলায়মান আহম্মেদ	০৮/১০/০২	- ১২/০২/০২
১০)	জনাব আহমেদ মুসা	১৩/০২/০২	- ১৫/০২/০৪
১১)	জনাব মোঃ শফিক-উল-ইসলাম	১৬/০২/০৪	- ১৫/০২/০৫
১২)	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (চলতি দায়িত্ব)	১৬/০২/০৫	- ০১/০৩/০৫
১৩)	জনাব মোঃ শফিক-উল-ইসলাম	০২/০৩/০৫	- ০১/০৩/০৬
১৪)	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম (চলতি দায়িত্ব)	০২/০৩/০৬	- ১৬/০৩/০৬
১৫)	জনাব মোঃ শফিক-উল-ইসলাম	১৭/০৩/০৬	- ০৫/১১/০৬
১৬)	বেগম মাহমুদা মিন আরা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)	১৬/১১/০৬	- ০৩/১২/০৬
১৭)	জনাব শেখ আলাউদ্দিন	০৪/১২/০৬	-

১১। ফাউন্ডেশনের কর্মকাণ্ড

আবহমান বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে সোনারগাঁওয়ের পানাম নগরে একটি সরকারি রিকুইজিশনকৃত পুরনো ভবন সংস্কার করে ঐ ভবনে অস্থায়ীভাবে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরের কাজ শুরু করা হয়। অতপর ১৯৮১ সালে বর্তমান ফাউন্ডেশন এলাকায় পুরাতন সর্দার বাড়িতে জাদুঘর স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে দুটি লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর রয়েছে।

(১) লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

এ জাদুঘরে মোট ১১টি গ্যালারি আছে। জাদুঘরের গ্যালারিসমূহ নিম্নরূপ :-

ক. নিপুণ কাঠ খোদাই গ্যালারি;
খ. গ্রামীণ জীবন গ্যালারি;
গ. পটচিত্র ও মুখোশ গ্যালারি;
ঘ. নৌকার মডেল গ্যালারি;
ঙ. উপজাতি গ্যালারি;
চ. লোকজ বাদ্যযন্ত্র ও পোড়ামাটির নিদর্শন গ্যালারি;
ছ. লোহার তৈরি নিদর্শন গ্যালারি;
জ. তামা-কাঁসা-পিতলের তৈজসপত্র গ্যালারি;
ঝ. লোকজ অলংকার গ্যালারি;
ঞ. বাঁশ-বেত, শীতল পাটির গ্যালারি;
ট. বিশেষ প্রদর্শনী গ্যালারি।

(২) শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর

১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে স্থাপিত শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘরে মোট ২টি গ্যালারি রয়েছে।

নীচতলায় নিপুণ কাঠখোদাই গ্যালারিতে কাঠের তৈরি প্রাচীন ও আধুনিক কালের নিদর্শন দ্রব্য দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে কাঠ থেকে বিভিন্ন কারুপণ্য তৈরি ও বিক্রির সামগ্রিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে ডিওরোমা মডেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয় তলায় জামদানি ও নকশিকাঁথা গ্যালারিতে সোনারগাঁওয়ের বিখ্যাত ও ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন মোটিফ ও রঙের নকশার জামদানি শাড়ি

প্রদর্শন করা হয়েছে। এছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় নকশিকাঁথা প্রদর্শন করা হয়েছে। সেই সঙ্গে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ডিওরোমায় তুলা থেকে বস্ত্র তৈরির সামগ্রিক ধারাবাহিক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

ক. জাদুঘরে মোট সংগৃহীত নিদর্শন দ্রব্যের সংখ্যা প্রায় ৪৩০০টি
খ. গ্যালারিতে প্রদর্শিত নিদর্শন ৯৩৮টি
গ. স্টোরে সংরক্ষিত ৩৩৬২টি

(৩) মেলা ও প্রদর্শনী

৩.১ দেশে প্রদর্শনী
ক. আয়োজিত মোট মেলা ৩২টি
খ. বিশেষ প্রদর্শনী ১৫টি
গ. সেমিনার ৫১টি
ঘ. কর্মরত কারুশিল্পীদের প্রদর্শনী ১৯৯৬ থেকে শুরু হয়েছে। প্রতিবছর মেলায় কর্মরত কারুশিল্পীদের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

৩.২ বিদেশে প্রদর্শনী
ক. কোরিয়া-১৯৭৯ খ. ব্যাংকক-১৯৮১
গ. দিল্লী-১৯৮৩ ঘ. পাকিস্তান-১৯৯৫

(৪) লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনে লোক ও কারুশিল্পের উপর গবেষণার প্রয়োজনে বর্তমানে একটি লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার রয়েছে। এখানে প্রায় দশ হাজার গবেষণা-ধর্মী গ্রন্থসহ ম্যাগাজিন এবং অডিও ও ভিডিও এবং সিডিতে মেলা ও লোকজ উৎসবের ডকুমেন্ট সংরক্ষিত রয়েছে। এই লাইব্রেরির মাধ্যমে গবেষকগণ দেশ ও বিদেশের লোক ও কারুশিল্প সম্পর্কে গবেষণাকর্ম ও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেন। ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরিটি নবনির্মিত ডকুমেন্টেশন ভবনের নীচ তলায় মনোরম পরিবেশে স্থানান্তর করা হয়েছে এবং সকল পাঠকের জন্য লাইব্রেরিটি উন্মুক্ত।

(৫) গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি

এ কর্মসূচির আওতায় ফাউন্ডেশন থেকে বাংলাদেশের লোকশিল্পের ঐতিহ্যের নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থসামাজিক এবং নন্দনতাত্ত্বিক সকল মাত্রার অজানা তথ্য, তত্ত্ব উদ্ভাবনে গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রকাশনার তালিকা নিম্নরূপ :

১। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সেমিনার প্রবন্ধ-১৯৭৯, গ্রন্থকার-সৈয়দ মাহবুব আলম এবং সাইফুদ্দিন চৌধুরী

২। Bangladesh Folk Art & Crafts Foundation-1979, Seminar Paper, Written by Syed Mahbub Alam

৩। Historic Sonargaon-1979, Compiled by Mr. Saifuddin Chowdhury.

৪। ঐতিহাসিক সোনারগাঁ-১৯৭৯, লেখক জনাব সাইফুদ্দিন চৌধুরী

৫। SONARGAON, Compiled by Dr. S.M. Hasan 1982.

৬। লোক ঐতিহ্য, ১৯৮৩
সম্পাদনা : ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, গ্রন্থকার : সৈয়দ মাহবুব আলম

৭। বাংলাদেশের লোক শিল্প (প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫)
সম্পাদনা : ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান

৮। Museum Guide, Folk Art Museum, Sonargaon-1983, Edited by Dr. Syed Mahmudul Hasan.

৯। লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর, সোনারগাঁও ১৯৮৭
সম্পাদনা : জনাব এস.কে.এম. শামসুল হক

১০। বাংলাদেশের লোকশিল্প ১৯৮৮ (লোকশিল্পের গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন)। সম্পাদনা : জনাব এস.কে.এম. শামসুল হক

১১। স্মরণিকা : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ১৯৯২
সম্পাদনা : জনাব কে.এম. হাবিব উল্লাহ্

১২। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৩
সম্পাদনা : জনাব কে.এম. হাবিব উল্লাহ্

১৩। ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের জরিপ ও দলিলীকরণ, ঢাকা অঞ্চল-১৯৯৩। প্রকাশনায় : বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সম্পাদনা : জনাব বিশ্বনাথ সরকার

১৪। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৪
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

১৫। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৫
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

১৬। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৫-এর প্রতিবেদন
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

১৭। কারুময় ফ্রেম প্রদর্শনী ও সেমিনার-এর স্মরণিকা ১৯৯৬
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

১৮। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৬
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

১৯। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৬-এর প্রতিবেদন
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

২০। স্মরণিকা : শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ১৯৯৬
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

২১। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৭
সম্পাদনা : জনাব বজলুর রহমান ভুঁইয়া

২২। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৮
সম্পাদনা : জনাব আ.ন.ম. আবদুল্লাহ্

২৩। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৯
সম্পাদনা : সৈয়দ মাহবুব আলম

২৪। লোকশিল্প
প্রকাশকাল : জুন ১৯৯৯
গ্রন্থকার-সৈয়দ মাহবুব আলম

২৫। লোকশিল্প প্রবন্ধ (সংকলন)
সম্পাদনা : সৈয়দ মাহবুব আলম, জুন ১৯৯৯

২৬। লোক কারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ১৯৯৯-এর প্রতিবেদন
সম্পাদনা : সৈয়দ মাহবুব আলম

২৭। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০০
সম্পাদনা : সৈয়দ মাহবুব আলম

২৮। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১
সম্পাদনা : সৈয়দ মাহবুব আলম

২৯। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০১-এর প্রতিবেদন
সম্পাদনা : সৈয়দ মাহবুব আলম

৩০। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০২
সম্পাদনা : জনাব আহমেদ মুসা

৩১। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০২-এর প্রতিবেদন
সম্পাদনা : জনাব আহমেদ মুসা

৩২। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৩
সম্পাদনা : জনাব আহমেদ মুসা

৩৩। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৩-এর প্রতিবেদন
সম্পাদনা : জনাব আহমেদ মুসা

৩৪। ঐতিহাসিক সোনারগাঁ পরিদর্শন গাইড
প্রকাশকাল : জুন ২০০৩
সম্পাদনা : জনাব আহমেদ মুসা
রচনা : জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক

৩৫। A GUIDE TO VISIT HISTORIC SONARGAON
Publication : June 2003
Edited by : Mr. Ahmed Musa
Written by : Mr. AKM Muzzammil Haque

৩৬। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৪
সম্পাদনা : জনাব আহমেদ মুসা

৩৭। জাদুঘর পরিদর্শন গাইড
প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০০৪
রচনা : জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক

৩৮। Intangible Cultural Heritage and Sonargaon Folk Museum
Publication : November 2004
Written by : Mr. Shafique-ul-Islam (Mahmud Shafique)

৩৯। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৫
সম্পাদনা : জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসেন

৪০। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি
প্রকাশকাল : জুন ২০০৫
সম্পাদনা : জনাব মাহমুদ শফিক

৪১। বাংলাদেশের কারুপণ্য
প্রকাশকাল : জুন ২০০৫
সম্পাদনা : জনাব মাহমুদ শফিক

৪২। কারুশিল্পীদের তালিকা
প্রকাশকাল : জুন ২০০৫
সম্পাদনা : জনাব মাহমুদ শফিক

৪৩। লোকসংস্কৃতি
প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০০৫
লেখক : জনাব মাহমুদ শফিক

৪৪। সোনারগাঁও জাদুঘর
প্রকাশকাল : মে ২০০৬
রচনা : জনাব একেএম মুজ্জাম্মিল হক

৪৫। লোকসংস্কৃতির স্বরূপ
প্রকাশকাল : জুন ২০০৬
লেখক : জনাব মাহমুদ শফিক

৪৬। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
প্রকাশকাল : জুন ২০০৬
সম্পাদক : ড. বিশ্বনাথ সরকার

৪৭। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৭
সম্পাদনা : জনাব শেখ আলাউদ্দিন

৪৮। স্মরণিকা : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮
সম্পাদনা : জনাব শেখ আলাউদ্দিন

৪৯। প্রতিবেদন : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব প্রতিবেদন-২০০৮
প্রকাশকাল : জুন ২০০৮
সম্পাদক : জনাব শেখ আলাউদ্দিন

৫০। ঐতিহ্য : লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধ সংকলন
প্রকাশকাল : জুন ২০০৮
সম্পাদক : জনাব শেখ আলাউদ্দিন

৬। লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসবের অনুষ্ঠানাদি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অবকাঠামো অর্থনৈতিক এবং উপরিকাঠামো-সাংস্কৃতিক এই উভয় কর্মকাণ্ডের মিলনক্ষেত্র হচ্ছে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব। এছাড়া লোকমেলার আকর্ষণ চিরায়ত বাংলার মাঠে ঘাটে প্রান্তরে নদী বনান্তরে ঘুরে বেড়ানো লোকসংগীত শিল্পীদের সমাগম। লোকমেলায় মূলত গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। লোকমেলার এ তাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশন লোকজ পরিবেশে প্রতিবছর লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন করে থাকে। মেলায় দেশের নানা অঞ্চলের লোকশিল্পীরা জারি-সারি, বাউল, পালাগান, শরিয়তি ও মারফতি, হাসন রাজার গান, গায়ে হলুদের গান, বৃষ্টির গান, ঘেঁটু গান, আলকাপ গান, ভাওয়াইয়া গান, গম্ভীরা গান, কবিগান এবং উপজাতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালা পরিবেশন করে। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকশিল্পী ও লোকসংগীতশিল্পী মেলা ও লোকজ উৎসবে অংশগ্রহণ করে থাকে। মেলায় প্রতিবছর হারিয়ে যাওয়া গ্রামীণ খেলা স্কুলের ছেলেমেয়েদের দিয়ে পরিবেশন করানো হয়। সেই সঙ্গে লাঠিখেলা, দোক খেলা, মোরগের লড়াই, কুস্তি খেলা, দাঁড়িয়াবান্দা, ঘুড়ি উড়ানো, পানিতে হাঁসধরা ইত্যাদি খেলা পরিবেশিত হয়। এছাড়া গ্রামীণ লোকসমাজের পরিচিত দৃশ্যের লোকজীবন প্রদর্শনী, লোককারুশিল্প এবং লোক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত নানা বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ফাউন্ডেশন প্রতিবছর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী এবং জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করে থাকে।

৭। ফাউন্ডেশনের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

১। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর ও শিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠা (১৯৭৭-১৯৭৯) : প্রকল্প ব্যয় ৪৯.৩৪ লক্ষ টাকা।

২। সোনারগাঁও লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ও শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ (১৯৮০-১৯৮৫) : প্রকল্প ব্যয় ৬৫.৩৫ লক্ষ টাকা।

৩। সোনারগাঁও লোকশিল্প জাদুঘর (সংশোধিত) (১৯৮৭-১৯৯০) : প্রকল্প ব্যয় ৪৯৬.৩২ লক্ষ টাকা।

৪। সোনারগাঁয়ে কারুশিল্প গ্রাম উন্নয়ন : প্রকল্প ব্যয় ৭৩২.০০ লক্ষ টাকা। (১৯৯৮-জুন ২০০৬)

উপর্যুক্ত তিনটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক ইতোমধ্যে গত ৩৪ বছরে নিম্নরূপ অগ্রগতি হয়েছে

ক। ফাউন্ডেশনের জন্য ১৭০ বিঘা জমি হুকুমদখল হয়েছে।

খ। গত ৩৪ বছরে ১৭০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী বাংলাদেশের বৈশিষ্ট্যময় সমতলভূমি, জলাভূমি ও প্রকৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত আঁকাবাঁকা দৃষ্টিনন্দন হ্রদ নির্মাণ করা হয়েছে।

গ। স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী নির্মিত কৃত্রিম আঁকাবাঁকা জলাশয় খালের বৈশিষ্ট্যের নিরিখে নতুন ভূমি বৈশিষ্ট্য মোতাবেক গাছপালা সম্বলিত নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যের দিগন্ত সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ। ভূ-দৃশ্যের স্থানে লোককারুশিল্প জাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে।

ঙ। স্থাপন করা হয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো।

চ। জনবল : ৫৫ (পঞ্চান্ন) জন।

কারুশিল্প গ্রাম

প্রকল্পটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল আবহমান বাংলাদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের সৃষ্ট শিল্পকলা, লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন, উৎপাদন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষে ফাউন্ডেশনের ১৭০ বিঘা আয়তনের কমপ্লেক্সে সংশোধিত মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে লোক ও কারুশিল্প সৃষ্টির সঙ্গে সম্পৃক্ত কারুশিল্পগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উল্লিখিত ১৭০ বিঘা ভূমিকে ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশে পরিণত করা। কারুশিল্পগ্রামে বাংলাদেশের চিরায়ত গ্রামীণ প্রকৃতি ও পরিবেশে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসা কারুশিল্পীগণও তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শেখা কারুশিল্পের নিদর্শন যা এখন আর তৈরি হচ্ছে না বা হারিয়ে যেতে বসেছে তা তৈরি করবে।

মূলত কারুশিল্পগ্রাম প্রকল্প লোকজীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশকেন্দ্রিক গ্রামের সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, বিশেষ করে কারুশিল্পীদের আঞ্চলিক ঘরবাড়ি সম্বলিত গ্রামীণ স্থাপত্যের অনুপুঙ্খের বাস্তব গঠন ও গড়নের অবকাঠামো প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শিল্পগ্রামে বাংলার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের বৈচিত্র্যময় লোকজ স্থাপত্যের প্রাচীন এবং চলমান রূপের ধারাকে তুলে ধরা হবে।

বাস্তবায়িত প্রকল্পের প্রধান প্রধান অঙ্গসমূহ

ক) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ;

খ) ভূমি উন্নয়ন;

গ) ডকুমেন্টেশন ভবন ও সেল সেন্টার নির্মাণ;

ঘ) পাবলিক টয়লেট নির্মাণ;

ঙ) কারুব্রিজ (বড়) ১টি নির্মাণ;

চ) কারুব্রিজ (ছোট) ২টি নির্মাণ;

ছ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (২১৫০ ফুট)

জ) সীমানা প্রাচীর অলঙ্করণ;

ঝ) ২০ বিঘা জমি অধিগ্রহণ;

ঞ) বাংলাদেশের অঞ্চলভিত্তিক ঘরবাড়ি (কারুশিল্পগ্রাম) নির্মাণ :

১) মৃৎশিল্প; ২) কাঠ ও কাঠ খোদাই কারুশিল্প;

৩) হস্ত নির্মিত কাগজ কারুশিল্প;

৪) শাখা-ঝিনুক মুক্তা নারিকেলের কারুশিল্প;

৫) জামদানি শাড়ি তৈরি; ৬) নক্‌শিকাঁথা; ৭) তাঁতশিল্প;

৮) রেশম বস্ত্র; ৯) পাটজাত কারুশিল্প;

১০) বাঁশ-বেত কারুশিল্প;

১১) তামা-কাঁসা, সোনা-রূপার কারুশিল্প।

প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রকল্প

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শৈল্পিক অনুভূতি ও চেতনায় ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যৎ কর্মসূচির যে স্বপ্ন গড়েছিলেন তাঁর ভাষায় তা ছিল আদর্শ গ্রাম। তাঁর এ আদর্শ গ্রামের চেতনার পরিপ্রেক্ষিতে লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর এবং শিল্পগ্রাম-ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ-এর মূল লক্ষ্য অনুযায়ী এই প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

প্রস্তাবিত উল্লিখিত ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রকল্পটি ধারণা মূলত আবহমান বাংলার শাশ্বত রূপের বাস্তব অবকাঠামো, ভূমিরূপ; গ্রামীণ স্থাপত্য, নদী-নালা, পাহাড়, গাছপালা, পুকুর এবং বিভিন্ন বর্ণ ও গোষ্ঠীর মানুষ অর্থাৎ গ্রামীণ লোকজ পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের সমস্ত অঞ্চলকে এবং আঞ্চলিক লোক ও কারুশিল্পকে ক্ষুদ্রাকারে উপস্থাপন করার লক্ষ্য থেকেই উত্থিত হয়েছিল। এককথায় এটিকে বাংলাদেশের ভেতর একটি মিনি বাংলাদেশ বলা যায়। ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ সমগ্র বাংলাদেশেরই ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং অন্যান্য পরিচয়ের প্রতিনিধিত্ব করবে। এ আয়োজন কেবল আমাদের লোক ও কারুশিল্পকে সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনই করবে না বরং সমগ্র বিশ্ব ও পর্যটকদের কাছে এবং গবেষকদের কাছে আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরবে।

ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আরও জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হবে। বাংলাদেশের পাহাড়, ঝর্না, চা বাগান, বনাঞ্চল, সমুদ্র সৈকত ও উপজাতীয়দের জীবন ও পরিবেশ এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তাছাড়া বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী লোক কারুশিল্পের সংগ্রহশালা, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্রকে একটি ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করে এটিকে একটি আন্তর্জাতিক মিলনমেলায় পরিণত করা হবে। সেজন্য এ প্রকল্পের আওতায় একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিতে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের লোক ও কারুশিল্পের প্রদর্শন সম্ভব হবে, ফলে বাংলাদেশের সাথে সকল রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বিনিময় জোরদার হবে, সাংস্কৃতিক বন্ধন দৃঢ় হবে এবং দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত আরও মজবুত হবে। বাংলাদেশ তথা এশিয়ার কোনো দেশে এ জাতীয় কোনো সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রটিতে অডিটরিয়াম, সম্মেলন কক্ষ, প্রদর্শনী কক্ষ, ডরমিটোরি, মিডিয়া সেন্টার প্রভৃতি থাকবে।

আমাদের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ লোক ও কারুশিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ

কারুশিল্পীতে পরিণত করে তাদের উৎপাদিত পণ্যসমাগ্রীকে আন্তর্জাতিকভাবে বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করলে একদিকে যেমন গ্রামীণ দরিদ্র কারুশিল্পীগণ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবে অন্যদিকে দেশ আয় করবে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। কারুশিল্পের প্রশিক্ষকগণও এ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন অঙ্গনটি ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশে পরিণত হবে। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতির ধারায় নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে। তাছাড়া বাংলাদেশ এশিয়ার সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণের গৌরব অর্জন করবে।

ক্ষুদ্রাকার বাংলাদেশ প্রকল্পের মূল অঙ্গ বা কম্পোনেন্টসমূহ

ক) দপ্তর/ব্যবহারিক এলাকা
খ) ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স ও মিনি বাংলাদেশ
গ) ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ উন্নয়ন
ঘ) বাংলাদেশের শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের জীবন
ঙ) বাংলাদেশের চিরায়ত লোকখেলাধুলার পরিবেশ
চ) প্লান্টেশান নার্সারি ও পাখিদের জন্য অভয়ারণ্য
ছ) বাংলাদেশের সকল উপজাতির ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক পারিপার্শ্বিক জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং তাদের স্ব স্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ পরিবেশ তৈরি
জ) বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন পেশার পেশাজীবী যেমন কামার-কুমার, তাঁতী, জেলে প্রভৃতি গ্রামীণ পেশার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যসহ আবহমান বাংলার গ্রাম স্থাপন এবং ভাওয়াইয়া, পল্লীগান, বাউলগান প্রভৃতি শিল্পীর জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিকরণ
ঝ) কারুশিল্পীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ
ঞ) আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ
ট) অডিটোরিয়াম নির্মাণ
ঠ) সম্মেলন কক্ষ ও আন্তর্জাতিক লোক ও কারুশিল্প কমপ্লেক্স নির্মাণ
ড) ডরমিটরি নির্মাণ
ঢ) সীমানা প্রাচীর নির্মাণ
ন) পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
প) অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ
ফ) বিশুদ্ধ ও নিরাপদ পানি সরবরাহকরণ
ব) গ্যাস সরবরাহকরণ
ভ) টিকেট কাউন্টার ও গার্ড রুম নির্মাণ
ম) গোডাউন নির্মাণ
য) আরসিসি সেতু নির্মাণ
র) কার পার্কিং-এর জন্য পেভমেন্ট নির্মাণ
ল) রেস্ট হাউজ নির্মাণ
শ) ভূমি উন্নয়ন প্রভৃতি।

আঞ্চলিক লোককারুশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা

সমগ্র বাংলাদেশে যে সব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি- অঞ্চল রয়েছে তা বিভাগওয়ারী অঞ্চলসমূহে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায়। এপরিপ্রেক্ষিতে ৬টি বিভাগ যথা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগে আঞ্চলিক লোকসংস্কৃতির উপাদান, লোক কারুশিল্প এবং বৈশিষ্ট্যময় লোকজীবন ধারার স্থানিক রূপের পরিচয় তুলে ধরতে আঞ্চলিক লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত না হওয়ায় প্রকল্পটির ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

(২) ভৌত অবকাঠামো ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারণ প্রকল্প

প্রাক্কলিত ব্যয় ৯৮০.০০ লক্ষ টাকা (২০০৮-২০১০)

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য হল আমাদের ঐতিহ্যবাহী লোক ও কারুশিল্পের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন ও পুনরুজ্জীবন। এ পর্যন্ত ৪৩০০টি দুর্লভ কারুশিল্প নিদর্শন সংগৃহীত করা হয়েছে। ২টি জাদুঘরের ১৩টি গ্যালারিতে মাত্র ৯৩৮টি নিদর্শন প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে। আমাদের অতীত ঐতিহ্যের পরিচয়বাহী এ সকল নিদর্শন দ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ তাই জরুরি। নতুন অধিগ্রহণকৃত ১৮ বিঘা জমিতে সীমানা প্রাচীর না থাকায় ফাউন্ডেশনের নিরাপত্তার দিকটি নাজুক হয়ে পড়েছে। ফাউন্ডেশনের নিরাপত্তার স্বার্থে তাই সীমানা প্রাচীর নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। ফাউন্ডেশনে যানবাহন পার্কিং-এর জন্য পর্যাপ্ত স্থান ও ব্যবস্থা না থাকায় যানজটসহ বহুবিধ সমস্যার কারণে দর্শনার্থীরা যে ভোগান্তির সম্মুখিন হন তা নিরসনের লক্ষ্যে পার্কিংস্থান সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বন্যার সময় ফাউন্ডেশনের নীচু এলাকা পানিতে প্লাবিত হয়। কারুপল্লীই এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ পল্লীর স্টল কাঁচা। স্টল গ্রহীতা এবং দর্শনার্থী উভয়ই বিশেষ করে বৃষ্টির দিনে অবর্ণনীয় প্রতিকূলতার সম্মুখিন হন। কারুপল্লীর রাস্তা পাকা ও স্টলসমূহ আধা পাকা করা হলে দর্শক ও স্টল গ্রহীতা উভয়ই সমানভাবে উপকৃত হবেন। তা ছাড়া কারুপণ্যের অধিক বিক্রয়ে কারুশিল্পের যেমন প্রসার ঘটবে তেমনি ফাউন্ডেশনের আয়ও বৃদ্ধি পাবে। দর্শনার্থীদের অসুবিধার কথা বিবেচনায় এনে ফাউন্ডেশনের প্রবেশ পথে প্রধান ফটক এবং টিকেট কাউন্টার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছে।

ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারিদের আবাসন সমস্যা রয়েছে। তাছাড়া দেশি-বিদেশি অতিথি ও পর্যটকদের সাময়িক অবস্থানের জন্য তেমন কোন সুবিধা সৃষ্টি করা এখনো সম্ভব হয়নি।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ নিম্নরূপ;

(১) সীমানা প্রাচীর সম্প্রসারণ
(২) শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ও প্রশাসনিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
(৩) গেস্ট হাউস নির্মাণ
(৪) অফিসার্স কোয়ার্টারের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ
(৫) তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারিদের আবাসিক ভবন নির্মাণ
(৬) কারপার্কিং এলাকা উন্নয়ন
(৭) ভূ-গর্ভস্থ বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ
(৮) ভূমি উন্নয়ন ও সৌন্দর্য বর্ধন
(৯) প্যাডেল বোট ক্রয়
(১০) গণ শৌচাগার নির্মাণ
(১১) প্রধান গেইট নির্মাণ
(১২) টিকেট কাউন্টার-কাম গার্ড হাউস নির্মাণ

(১৩) কারুপল্লীর ৫০টি অর্ধপাকা স্টল নির্মাণ

(১৪) কারুব্রিজ নির্মাণ

(১৫) অভ্যন্তরীণ পাকা রাস্তা নির্মাণ

(১৬) লোকজ মঞ্চ নির্মাণ

(১৭) আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি ক্রয়

(৩) এছাড়া দর্শনার্থী বিশেষ করে বাংলাদেশকে জানার আগ্রহ নিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে সকল শিক্ষার্থীরা জাদুঘর বা ফাউন্ডেশন পরিদর্শনে আসেন, তাদের খাওয়া-দাওয়া, বসার ব্যবস্থা, প্রয়োজনে রান্নার ব্যবস্থা এবং টয়লেট সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন অধিগ্রহণকৃত জমিতে একটি বিনোদন/পিকনিক স্পট নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিনোদন/ পিকনিক স্পটের নাম দেয়া হয়েছে 'ঐতিহ্য'।

একসঙ্গে ৪০০ দর্শনার্থী স্পটটি ব্যবহার করতে পারবেন। স্পটে যাবার জন্য ৩৬০ ফুট রাস্তা নির্মাণসহ সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য শোভাবর্ধক প্রজাতির গাছ রোপণ করা হয়েছে।

চলমান উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

(১) শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের অবদানকে স্মরণ করা ও তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিল্পাচার্যের আবক্ষ ভাস্কর্য স্থাপনের বিষয়ে পরিচালনা বোর্ডের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাস্কর্য শিল্পী শ্যামল চৌধুরীকে দিয়ে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের আবক্ষ ভাস্কর্য নির্মাণ করা হচ্ছে। অতি শীঘ্রই এ নির্মাণ কাজটি সম্পন্ন হবে।

(২) বাংলাদেশের কারুশিল্পীরা এখনও অবহেলিত। তাদের আর্থিক সঙ্গতি এবং সামাজিক পরিচয় তেমন নেই। যারা আমাদের সোনালি অতীত অনেক দক্ষতার সাথে তুলে এনেছেন তাদের শিল্পকর্মে, মননে ও মেজাজে, তাদের যথাযথ মর্যাদা প্রদানের বিষয়টিও ফাউন্ডেশন চিন্তা করেছে। গুণী কারুশিল্পীদের যথাযথ মর্যাদায় অভিষিক্ত করা ও স্বীকৃতি প্রদান করা হলে– তারা এ শিল্পের প্রতি আরো অনুরাগী হবেন– সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে তাদের আর্থিক অবস্থানও সুদৃঢ় হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে 'শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পী পদক' প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রতিবছর ৩টি বিষয়/মাধ্যমের ৩ জন শ্রেষ্ঠ কারুশিল্পীকে এই পদক প্রদান করা হবে। পদক হবে ১৮ ক্যারেটের ১ ভরি ওজনের স্বর্ণনির্মিত। একটি সম্মাননা পত্রসহ পুরস্কার স্বরূপ নগদ ৩০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়েছে।

ফাউন্ডেশনের বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের আয়, ব্যয় এবং সঞ্চয়ের একটি হিসাব বিবরণী নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক্র: নং	অর্থবছর	আয়	ব্যয়	সঞ্চয়
১.	২০০৩-২০০৪	৩৬,৪৬,৭০০.২৫	৩২,৬১,৯২২.৫০	৩.৮৪,৭৭৭.৭৫
২.	২০০৪-২০০৫	৩৮,৪৬,৪৭৩.০১	৩৯,১৫,৫১৪.৬৮	(-) ৬৯.০৪১.৬৭
৩.	২০০৫-২০০৬	৪৪,৩৫,৮৯৪.৯৫	৪০.১৫,৯২২.৬৮	৪,১৭,৯৭২.২৭
৪.	২০০৬-২০০৭	৬৭,৭৬,১৬৪.২৪	২৯,৫০,৪৯৬.০০	৩৮,২৫,৬৬৮.২৪
৫.	২০০৭-২০০৮	১,০৫,৭৯,৮৮৩.৪০	৩৪,১২,৮৮৮.০০	৭১,৬৬,৯৯৫.৪০

এক নজরে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮

আমাদের লোকসংস্কৃতি ও লোককারুশিল্পের ঐতিহ্যের নিদর্শনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে নিয়োজিত বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের লোকজ পরিবেশে ১৯৯১ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব এর আয়োজন করে আসছে। বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন গত ০৮ মাঘ ০৭ ফাল্গুন ১৪১৪ বঙ্গাব্দ ২১ জানুয়ারি-১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর আয়োজন করে।

গত ০৮ মাঘ ১৪১৪/২১ জানুয়ারি ২০০৮ বিকেল ৩-০০ টায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উদ্বোধন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শরফুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর শুভ উদ্বোধন করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসক এবং ফাউন্ডেশনের পরিচালনা বোর্ডের সম্মানিত সদস্য জনাব ফাইজুল কবীর।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব শেখ আলাউদ্দিন।

মেলার সাজসজ্জা

বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন আবহমান বাংলার গ্রামীণ পরিবেশে একইসাথে মেলা ও লোকজ উৎসব আয়োজন এ মেলার একটি অন্যতম আকর্ষণ। ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে প্রতি বছরই নানা রূপে নতুন আঙ্গিকে শৈল্পিক সাজসজ্জায় উপস্থাপন করা হয় ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণকে। গত বছরেও মেলা উপলক্ষে ফাউন্ডেশন চত্বরের প্রায় সর্বত্রই ছিল শৈল্পিক স্থাপনা। ফাউন্ডেশনের প্রধান গেইট থেকে কারুপল্লী পর্যন্ত সাজসজ্জায় ছিল বর্ণাঢ্য ফেস্টুন। কিছু ফেস্টুনে ছিল লোক ঐতিহ্যের বিষয়ে বিভিন্ন শ্লোগান ও উপদেশাবলী। যা থেকে মেলায় আগত দর্শকগণ আমাদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা নিতে পেরেছেন। এছাড়া কিছু কিছু ফেস্টুনে আলপনা ও লোকজ চিত্র শোভা পেয়েছিল। প্রশাসনিক ভবনে একটি ব্যানারে লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ লেখা প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়া দুটি জাদুঘর ও প্রশাসনিক ভবনে আলপনা অঙ্কিত ব্যানার, ফেস্টুন এবং মৃৎপাত্রে বিভিন্ন গ্রামীণ নক্শা অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শিত হয়। মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ আয়োজন উপলক্ষে ফাউন্ডেশনের প্রশাসনিক ভবনটিকে নান্দনিকভাবে সাজানো হয়েছিল।

মেলার সাজসজ্জার আরেকটি আকর্ষণীয় স্থান ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল লোক ও কারুশিল্প জাদুঘর ভবন সংলগ্ন দেয়ালে এবং ক্যাফেটিরিয়ার সামনে দুপাশের দেয়ালে গ্রামীণ জীবন ভিত্তিক অঙ্কিত ম্যুরাল চিত্রটি যা মেলার পরিবেশকে আরও উৎসব মুখর করে তোলেছিল। এছাড়া লাইব্রেরি ভবনের বিপরীত দিকে ৫টি লোকজীবন ভিত্তিক চিত্র কর্ম; যথা: পণ্ডিতের পাঠশালা, বিয়ের দৃশ্য, নবান্নের উৎসব, গ্রাম্য বিচার ও ফুলের ডালা সাজানোর দৃশ্য যেখানে স্কুলের ছেলেমেয়েদের পরিবেশনায় গ্রামীণ লোকজীবনের প্রবহমান চিত্র প্রদর্শিত হয়।

এ মেলার অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপনাটি ছিল ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চ। প্রচলিত গ্রামীণ প্রযুক্তির মাধ্যমে সাতচালা ছনের লোকজ মঞ্চ সজ্জিত করা হয়। এ মঞ্চটির ভেতরের অংশে বেতের কারুকাজ করে এটিকে আরও আকর্ষণীয় করা হয়। মঞ্চটি মেরামত ও সংস্কার কাজে অভিজ্ঞ শ্রমিক দীর্ঘ সময় কাজ করে এর সাজ সজ্জার কাজ সম্পন্ন করেন। গ্রামীণ অবকাঠামোয় তৈরি মঞ্চটি দর্শকদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। এছাড়া ফাউন্ডেশনের মেলার মাঠ, কারুশিল্পগ্রাম, খেলার মাঠ, কারুপল্লীসহ প্রায় সকল স্থানে ব্যানার ফেস্টুন ও লোকজ চিত্রকর্ম দিয়ে সাজানো হয়। অনুপম প্রকৃতি শোভিত ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন স্থানে টবে নানা রঙের ফুলের গাছ দিয়ে নান্দনিক সৌন্দর্য্যের পরশ দেয়া হয়।

মেলার অনুষ্ঠান

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামল বৈচিত্র্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের লীলাভূমি বাংলাদেশে রয়েছে জারি, সারি, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদি, মারফতি, লালনগীতি এবং হাসন রাজার মত হাজারো লোকসংগীতের ভাণ্ডার। লোকসংগীতে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন বিকেলে বাউলগান, মাইজভাণ্ডারী গান, হাসন রাজার গান, লালনগীতি, কবিগান, আলকাপগান, গম্ভীরাগান, জারিগান, সারিগান, ভাওয়াইয়া-ভাটিয়ালি গান, গীতিনৃত্য নাট্য, লোকজ গল্প বলা, উপজাতীয় সংগীতসহ নানা ধরনের লোকজ গান পরিবেশিত হয়। মাসব্যাপী মেলা ও লোক উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকজমঞ্চে আলোচনা অনুষ্ঠানের পর এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে ক্লোজ আপ ওয়ান তারকা শিল্পী সালমা ও মুহিন লোকসঙ্গীত পরিবেশন করেন। বিপুল সংখ্যক দর্শক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) সংগীত শিল্পী, লোক নৃত্য শিল্পী ও লোকজ বাদ্যযন্ত্রী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। মাসব্যাপী মেলায় কিশোরগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাসহ ফাউন্ডেশনের খেলার মাঠে ১৫টি স্কুলের প্রায় ১৫০০ জন ছাত্র/ছাত্রী গ্রামীণ খেলা পরিবেশন করে। এছাড়া লোকজ দোক খেলা ও দাঁড়িয়াবান্দাসহ নানা ধরনের খেলাও মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মরত কারুশিল্পী প্রদর্শনী

আমাদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরায় আবিষ্কার করা, অজানা কারুশিল্প ও শিল্পীকে মেলায় আগত লোক সম্মুখে তুলে ধরা, কৃতি কারুশিল্পীদের কাজের প্রেরণা যোগানো এবং কারুশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করা বাংলাদেশ লোক ও করুশিল্প ফাউন্ডেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে প্রতিবছর ফাউন্ডেশন প্রাঙ্গণে আয়োজিত মেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অজানা দক্ষ কারুশিল্পীর শিল্পকর্মকে 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। গত বছরেও মেলায় 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল।

নিম্নোক্ত ১০ শ্রেণীর মোট ২০ জন দক্ষ কারুশিল্পী তাঁদের কারুপণ্য নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেন।

(১) মোঃ রমজান আলী ও রেজিয়া বেগম, শতরঞ্জি শিল্প, রংপুর
(২) মোঃ আবুল কালাম ও মনোয়ারা বেগম, তালপাতার হাতপাখা, চট্টগ্রাম
(৩) বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস ও রতন চন্দ্র দাস, দারুশিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
(৪) পরেশ চন্দ্র দাস ও রাজকুমার দাস, বেত শিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
(৫) সনাতন সিংহ ও লক্ষ্মীরাণী সিনহা, মণিপুরী তাঁত শিল্প, মৌলভীবাজার
(৬) হোসনে আরা ও শামীমা বেগম, নকশি কাঁথা শিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
(৭) মোঃ শাহজাহান আলি ও শফিকুল ইসলাম, বাঁশ-বেত শিল্প, টাঙ্গাইল
(৮) শংকর কুমার মালাকার ও রাম প্রসাদ মালাকার, শোলা শিল্প, মাগুরা
(৯) গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও বিদ্যুৎ কুমার চক্রবর্তী, শোলাশিল্প, খড়িখালি, ঝিনাইদহ
(১০) সুশান্ত কুমার পাল ও মৃত্যুঞ্জয় পাল, শখের হাঁড়ি শিল্প, রাজশাহী
(১১) হোসনে আরা ও নার্গিস আক্তার, নকশি কাঁথা, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
(১২) দ্বিপন বিশ্বাস ও কৃষ্ণা বিশ্বাস, লোহাশিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ
(১৩) মোঃ আবু তাহের ও আলেক, জামদানি শিল্প, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

মেলার স্টল

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কারুশিল্পজাত পণ্য সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য মেলাপ্রাঙ্গণে সর্বমোট ২৯২টি স্টল (হস্তশিল্পের স্টল ১০৬টি, স্টেশনারী দ্রব্যাদির স্টল ৬১টি, পোশাকের স্টল ৬৫টি, মিষ্টির স্টল ৩৯টি এবং খাবারের স্টল ২১টি) এর আয়োজন করা হয়েছিল।

মেলার বিশেষ আকর্ষণ

লোককারুশিল্প মেলা লোকজ উৎসব ২০০৮ এর বিশেষ আয়োজনে ছিল সোনারগাঁও উপজেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় গ্রামীণ খেলাধুলা। ফাউন্ডেশনের নির্ধারিত জায়গায় আবহমান বাংলার লোকজীবনের বিলুপ্ত প্রায় দৃশ্যাবলীর প্রদর্শন অর্থাৎ লোকজীবন প্রদর্শনী, নাগরদোলায় চড়া, শিশুদের ঘোড়ায় চড়া, নৌকা ভ্রমণ, যেমন খুশী গ্রামীণ সাজোসহ সংসাজা মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠান

ফাউন্ডেশনের মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা লোকজ উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো প্রতিবছর নতুন নতুন বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠান আয়োজন করা। ১৯৯৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সেমিনার অনুষ্ঠানকে লোকজ উৎসবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঐতিহ্যবাহী লোককারুশিল্প এবং লোক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে দেশের স্বনামধন্য লেখক ও বিশিষ্ট গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের লোক সংগীত, গ্রামীণ খেলাধুলা, লোকজবাহন, মৃৎশিল্প, জামদানি শাড়ি, শোলার কারুশিল্প, দারুশিল্প, তামা-কাঁসা-রূপা, লোকজ অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয় ভিত্তিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত বছর নিম্নোক্ত ৩টি বিষয়ের উপর সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

(১) গত ০১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার, বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় ফাউন্ডেশনের লোকজ মঞ্চে 'বাংলাদেশের লোকশিল্প : অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী, অধ্যাপক ফোকলোর বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রবন্ধকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তার উপস্থাপিত সেমিনারের উপর আলোচনায় অংশ নেন সৈয়দ মাহবুব আলম, প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং জনাব বাবুল মোশাররফ, সহকারী সম্পাদক, দৈনিক দেশ জনতা। সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব শেখ আলাউদ্দিন।

(২) ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৮, শুক্রবার বিকেল ৩-০০ ঘটিকায় ফাউন্ডেশনের লোকজমঞ্চে 'ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে সোনারগাঁ ও ঈসা খাঁর পরিচিতি' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে ড. হাবিবা খাতুন, অধ্যাপক ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, প্রবন্ধকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অত:পর তার উপস্থাপিত সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন জনাব শামসুদ্দোহা চৌধুরী, সাংবাদিক কলামিস্ট; জনাব ফরিদা শাইখ এনায়েত, প্রাক্তন ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট ভিপিএইচ, ডব্লিউএইচও।

সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব শেখ আলাউদ্দিন।

(৩) ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার, বিকেল ৩ ঘটিকায় ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে 'সোনারগাঁওয়ের কারুশিল্প' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের জাতিতত্ত্ব ও অলঙ্করণ শিল্পকলা বিভাগের কীপার ড. জিনাত মাহরুখ বানু প্রবন্ধকার হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

তার উপস্থাপিত সেমিনারের উপর আলোচনায় অংশ নেন জনাব একেএম আজাদ সরকার, প্রদর্শন অফিসার, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন এবং কবি কুমার চক্রবর্তী, উপসচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। সেমিনার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি আসাদ মান্নান, উপসচিব, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

উৎসব ও মেলায় আগত দর্শক-শ্রোতা

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এ প্রচুর দর্শক সমাগম হয়। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বিকেল ৫টা থেকে লোকজ অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রতিদিন গড়ে ৫,০০০ হাজার লোক সমাগম হয় এবং মেলা ও উৎসবে প্রায় ১,৫০,০০০ লোকের সমাগম হয়েছে। এছাড়া অনেক বিদেশী দর্শক, কূটনীতিকবৃন্দ মাসব্যাপী মেলা ও লোকজ উৎসব পরিদর্শন করেন। দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাংবাদিক, বাংলাদেশ বেতার, বিটিভি, বৈশাখী টেলিভিশন, এটিএন বাংলা, চ্যানেল আই-এর সাংবাদিকগণ লোককারুশিল্প মেলা ও উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানাদির সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেন।

গ্রামবাংলার লোকায়ত শিল্প এবং সাম্প্রতিক চিত্রকলা

রবিউল হুসাইন

যে কোনো দেশের চিত্রশিল্পে সাধারণত দুটি মূলধারা বিরাজ করে। একটি সনাতন বা লোকজ শিল্প আর একটি হচ্ছে সময়ের প্রতিঘাতে আস্তে আস্তে সম্প্রসারিত ও বিবর্তিত সাম্প্রতিক বা আধুনিক শিল্প ধারা। একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক– যুগে যুগে প্রবাহিত সাধারণ মানুষের দ্বারা পালিত ও চর্চিত হয়ে থাকে, প্রায় অপরিবর্তিত ধারার শিল্প, তাদের জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হাসি, কান্না, দুঃখ, বেদনা, সামাজিক ঘটনাবহুল আচার-বিচার, বাদ-প্রতিবাদ, জীবন-সংগ্রাম, অন্যায়-অবিচার নিয়ে কাঁচা হাতে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ চিত্র; অপরটি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়ে আগুয়ান প্রাচ্য-প্রতীচ্য আধুনিক জগতের সাম্প্রতিক ইঙ্গিতময় কিংবা বুদ্ধিদীপ্ত মননশীল চিন্তা, বোধ ও উপস্থাপনা দ্বারা একটি যুগোপযোগী শিল্পধারা। এই দুটি ধারা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নমুখী হলেও দ্বিতীয় ধারা সব সময়ই প্রথম ধারাটি দ্বারা প্রভাবিত ও নির্ভরশীল কিন্তু প্রথম ধারা কখনো দ্বিতীয় ধারার ওপর নির্ভর করে চর্চিত হয় না। আবহমান বাংলার লোকজ শিল্প তাই গভীর জীবনভেদী একটি চলমান স্রোত যা নীরবে-নিভৃতে কারোর প্রতি দৃষ্টি বা মুখাপেক্ষী না হয়ে একমনে অন্তঃস্থিত একটি নদীর ফল্গুধারার মতো স্রোতোস্বিনী হয়ে বয়ে যায় কালে কালে, যা সেই দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি ঋদ্ধিমান অবস্থানের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যময় কারুকাজ মৃৎশিল্প, বস্ত্রশিল্পের তাঁত ও তন্তুজাত সৃষ্টিশীলতা, বাঁশের কাজ, লোহা ও পিতলের কাজ, দারুশিল্প, দড়ি ও বেতের কাজ, পাটজাত দ্রব্যের নানাবিধ ব্যবহারিক কাজের জন্য শিল্প, নকশীকাঁথা শিল্প, লোকজ-স্থাপত্য, রন্ধন শিল্প, নৃত্য সঙ্গীত, চিত্র শিল্প, সাহিত্য, কাব্য– মোটকথা জীবনযাপনের জন্য সাধারণ মানুষের আবেগ, নান্দনিকতা, ব্যবহারিকতা, উপযোগিতা ও উপস্থাপনাসহ একটি সম্পূর্ণ ও যথার্থ চলমান শিল্প স্রোত আধুনিক শিল্প বহুলাংশে প্রাগুক্ত ধারা থেকে নিজের জন্য অনায়াসে হাত বাড়িয়ে সাহায্য গ্রহণ করে একটি নতুন উপস্থাপনায় হাজির হয়ে সেই শিল্পের একটি নান্দনিক মাত্রা অর্জনে সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। আধুনিক ধারার শিল্পকে গ্রহণ করে বা না করে সাধারণ বা অসাধারণ মানুষ অনায়াসে জীবনযাপন করতে পারেন। কিন্তু লোকজ ধারার বেলায় অন্য চিত্র। লোকজ শিল্প সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এটিকে বাদ দিয়ে তাদের জীবন চলে না। বাংলাদেশের লোকশিল্প তাই খুবই শক্তিশালী ও ঐতিহ্যময় এবং গৌরবের। যেহেতু এটি মৌলিক, আদি ও স্বয়ম্ভু তাই বহুমাত্রিক। আধুনিক শিল্পের বিকাশ লোকজ ধারা থেকে আস্তে আস্তে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত, বিবর্তিত, উন্মেষিত ও পরিশীলিত হয়ে হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। আধুনিক শিল্পধারায় সহজ-সরল বা লাইভ উপস্থাপনা একটি শক্তিশালী ও নান্দনিক অধ্যায় বলে বিবেচিত। পল ক্লি, রুশো প্রমুখ শিল্পীর কাজ সেই ধারার বলিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব বহন করে। বাংলাদেশে অধুনা এই ধারার কাজ শিল্পী আবদুস শাকুর শাহের ছবিতে সরাসরি প্রতিফলিত। পুঁথি সাহিত্যের ঘটনা– ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া, চাঁদ সওদাগর প্রমুখ চরিত্রমালা, নকশীকাঁথা, হাতপাখার নকশা, সূচিশিল্পের লোকজ শিল্পিত কাজ তার ক্যানভাসে অনায়াসে সহজ-সরলভাবে রং ও শৈলী নিয়ে উপস্থাপিত হয়। আফ্রিকার মুখোশ ও লোক-ভাস্কর্য শিল্প বা ইস্টার দ্বীপের রহস্যময় বিশাল ভাস্কর্য মূর্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাবলো পিকাসোর আধুনিক শিল্পিত করা গুহাচিত্রের সহজ-সরল ধারাও আধুনিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়েছে বিভিন্ন শিল্পী দ্বারা। ভারতের অজন্তা-ইলোরা থেকেও যেমনটি ঘটেছে। মোটকথা লোকজ শিল্প হচ্ছে শিল্পের আদি ও মূল আধার, যেখান থেকে ধারণা, শৈলী, পরিসর ও আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তুও আহরিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের জয়নুল আবেদিন, রফিকুন্নবী, শফিউদ্দিন আহমেদ, সুলতান, কামরুল হাসান, রশিদ চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী প্রমুখ বহমান বাংলার লোকজ শিল্পধারা থেকে তাদের শিল্প সৃষ্টি করা, সেই মতো একটি দেশজ মাত্রা সফলভাবে অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। কোনো শিল্পীই প্রকৃতপক্ষে দেশ, কাল, ঐতিহ্য ও সমাজ থেকে আলাদা সত্তায় বাস করতে পারেন না। জয়নুল যেখানে সাধারণ মানুষের জীবনচিত্র থেকে বিষয়বস্তু গ্রহণ করে লোকজশৈলীকে ভেঙে নিজের মতো করে সৃষ্টি করেছেন, শফিউদ্দিন এবং সুলতানও তাই। তবে প্রথমজনের কাজ যেখানে পরিশীলিত পরিধিতে বিন্যাসিত, অন্যজন নিজস্ব ধারায় লোক ও প্রাকৃতিক নিসর্গ দ্বারা প্রভাবিত। এদের মধ্যে সেই মতো বিচারে কামরুল হাসান লোকজ শিল্প ধারাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মস্থিত করে নিজস্ব একটি নান্দনিক লোকজ রূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। বাংলার পুতুল, মাটির নানাবিধ পাত্র, গ্রামের নারী, মানুষ, পশু-পাখি, নিসর্গ দৃশ্য থেকে তিনি অনায়াসে সহজ-সরল রেখা ও রংসমূহ নিয়ে তার নিজস্ব শিল্প সৃষ্টি করেছেন, যা এ দেশের চিত্রশিল্প জগতের অসামান্য সংযোজন। প্রকৃতপক্ষে চিত্রশিল্পে নিজের দেশের শিল্প-নির্যাস শিল্পীর সৃষ্টিশীলতায় ধরা পড়বেই এবং সেটি চিত্রশিল্পের মান বিচারে অন্যতম একটি নান্দনিক মাত্রা গঠন করতে সাহায্য করে। অবশ্য কেউ যদি সম্পূর্ণভাবে বিমূর্ত বা নৈরূপ্যক অবয়বহীন রীতির প্রতি নিবেদিত হয়ে চিত্র রচনায় মনোনিবেশ করেন তাহলে ভিন্ন কথা। প্রতিটি শিল্প মাধ্যমে এই দেশজ সময়, সমাজ, আবহাওয়া ও উপাদানের ব্যবহার প্রভূতভাবে হয়ে থাকে যেহেতু শিল্পীরা সেই দেশের সন্তান হিসেবে বসবাস করেন এবং ফলে সেই শিল্পটি হয়ে ওঠে মাটি, মানুষ আর দেশর পরিচয়ে পরিচি?হ্নত। এবং তাই তখন বলা হয় বাংলাদেশের সাহিত্য, কবিতা, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, গান, নৃত্য, স্থাপত্য, চলচ্চিত্র, কারুশিল্প কিংবা লোকশিল্প অর্থাৎ এই দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত একটি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাব, আবেগ, চিন্তা, চেতনা ও দৃষ্টি দ্বারা রচিত একটি পৃথক পরিচয়ের শিল্প, যা অন্য দেশ থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা ঘটে থাকে প্রতিটি দেশের মানবগোষ্ঠী দ্বারা সৃষ্ট ও অনুসরিত সেইসব দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে। এর সঙ্গে যোগ হয় বৈশ্বিক বা আন্তর্জাতিক মুক্ত বাতাসের অনুপ্রবেশ ঘটিত ও বিলোড়িত প্রভাব এবং প্রতিপত্তি। এই খোলা জানালা থেকে আসা বাইরের বাতাস অবশ্যই প্রয়োজনীয় ওইসব শিল্পের মান ও উৎকর্ষ বিনির্মাণে, যাকে বলা হয়ে থাকে আধুনিক শিল্প ভাবধারা-প্রসূত সৃষ্টকর্ম। আমাদের দেশে এই পালাবদল প্রথমবারের মতো ঘটে ইংরেজ উপনিবেশ আমলে, যেহেতু সেই সময় পশ্চিমা দেশে সামন্ত প্রথাছুট ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, রেনেসাঁ-পরবর্তী পরিবর্তন, বিজ্ঞান বিপ্লব, নৌবাণিজ্য, প্রথম মহাযুদ্ধ-পরবর্তী চিন্তা-চেতনা, দর্শন, মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্মের অপব্যবহারের ক্ষতিকারক ও অকল্যাণী প্রভাব থেকে উদার বিশুদ্ধ গোঁড়ামিহীন ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ, গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিকাশ, মানবধর্মপ্রসূত মানবকল্যাণকর চিন্তার সূত্রপাত ইত্যাদি দ্বারা একটি বিশাল ও ব্যাপক বাঁক বদল ও পরিবর্তন প্রতিটি ক্ষেত্রে ঘটতে থাকে। পূর্ববর্তী সময়ে দেশে দেশে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ-সম্রাটের সামন্তপ্রথা অনুসারী রাষ্ট্র শাসনে যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছিলো শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্য শিল্পে, যা অবশ্যই পৃথিবীর সামগ্রিক সভ্যতার উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত, সেগুলো ঘটেছিলো বিচ্ছিন্নভাবে একেকটি দেশের গণ্ডীর সীমারেখার মধ্যে সেইসব দেশের শিল্পপ্রেমিক প্রজাবৎসল শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা। সুমেরীয়, মিসর, আজটেক থেকে শুরু করে গ্রিক, রোমান, অটোমান, আরব, চীন, ভারত সভ্যতা সেই সময় সারা পৃথিবীতে বিভিন্নকালে গড়ে ওঠে। ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তি ফরাসি, ওলন্দাজ, ইংরেজ, পর্তুগিজরা বিভিন্ন উন্নত দেশে দস্যু মনোবৃত্তিজাত উন্নত নৌবাণিজ্যের জন্যে উদ্ভূত যান্ত্রিক নৌবিহার নিয়ে একেকটি দেশ দখল করে সেখানে লুণ্ঠন-অপহরণ, আত্মসাৎবৃত্তি চালিয়ে নির্মমভাবে রাজ্য শাসন করেছে। সেই দেশের বহমান ঐতিহ্যময় শিল্পধারাকে থামিয়ে নিজেদের মতবাদ চাপিয়ে দিয়েছে, কিন্তু কোনো সভ্যতা গড়তে পারেনি বরং উপদ্রুত ও দখলীকৃত দেশ থেকে সম্পদ আহরণ করে তারা নিজের দেশের উন্নতি সাধন করেছে এবং কালচক্রে সেই পশ্চিমা ঔপনিবেশিক ক্ষমতা ভোগকারী দেশগুলো থেকে জন্মলাভ করেছে ইউরোপীয় বা পশ্চিমা সভ্যতা– যাকে বলা হয় আধুনিক যুগ। মজা হচ্ছে, যে দেশগুলো অতীতে কখনো কোনো উল্লেখযোগ্য সভ্যতার ধারক-বাহক ছিলো না কাল-বিবর্তনে সেই দেশগুলোর সম্মিলিত সভ্যতাই এখনকার সবচেয়ে প্রাগ্রসর, প্রভাবশালী ও চলমান সভ্যতার ধারা, যা আন্তর্জাতিক পরিচয়ে বিশিষ্ট স্থান করেন আছে পৃথিবীব্যাপী। আর এই আধুনিক-পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন উপনিবেশছুট স্বাধীন দেশের বিভিন্ন শিল্প মাধ্যমে নিজের দেশের এতোদিন যাবত ভুলে থাকা শিল্প স্বকীয়তার মেলবন্ধন ঘটানোর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় দেশজ ও আন্তর্জাতিক বা আধুনিক দুটি ধারা মিলিত হয়ে নতুন আর একটি ধারার সৃষ্টি হয়েছে, সেটি হচ্ছে উত্তর-আধুনিক বা আধুনিকোত্তর ধারা। এই শিল্প ধারাতে অগ্রজদের মতো শিল্পী রশীদ চৌধুরী এগিয়ে আসেন তার প্রকৃত এক পৃথক ভঙ্গিতে। উপস্থাপনা, শৈলী, গঠন, উজ্জ্বল রং-এর বিন্যাস সবকিছু মিলে তিনি দেশজ বা লোকজ বিষয়বস্তুনির্ভর আধুনিক চিত্র সৃষ্টি ও দৃষ্টি সহকারে ছবি সৃষ্টি করেছেন। তার ছবির চিত্রপট ইঙ্গিত দেয় কোনো পূজা-পার্বণের দেব-দেবীসহ বিস্তৃত পেছনের জমিনকে। সব মিলে তার ছবির ক্যানভাসে ফুটে ওঠে সেই পূজা-চিত্রপটের সম্মিলিত বিভাজন ও সম্মেলন। তিনি সেখানে কালোর শক্তিশালী বেষ্টনীর মধ্যে বিভিন্ন উজ্জ্বল রং, রেখা, ফোঁটা, আকার সহকারে নিজস্ব এক দেশজ আবহাওয়া লালিত পটভূমি তৈরি করেছেন, যা একাধারে নিজের মাটি-সম্পৃক্ত আবার অন্যধারে অন্যের আকাশধারী। এইরকমভাবে কাইয়ুম চৌধুরী, রফিকুন্নবীসহ পরবর্তী প্রজন্মের মনসুরুল করিম, মোহাম্মদ ইকবাল, রোকেয়া সুলতানা, লায়লা নাজলী মনসুর প্রমুখ শিল্পী এবং আরো অনেকে– ধারাটি পুষ্ট করে চলেছেন। শিল্পী শিশির ভট্টাচার্য, ঢালী আল মামুন দিলারা বেগম জলিও উল্লেখ্য। কাইয়ুম চৌধুরী লোকায়ত গঠনকে সরাসরি গ্রহণ না করে গ্রামবাংলার মানুষ ও নিসর্গকে কেন্দ্র করে উজ্জ্বল রংয়ের সমাহারে আধা-বাস্তব অবয়বী মানুষ, পাখি, জীবজন্তু, গাছ-পালার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে ছবি সৃষ্টি করেছেন। রশীদ চৌধুরীর মতো কালো রং-এর প্রবল প্রাধান্য তার ছবিতে উল্লেখ্য। শিল্পী মনসুরুল করিমের রেখানির্ভর দ্রুত আনুভূমিক আড়াআড়িতে বিভাজিত ছবিতে বাংলার মাঠ, গাছ-পালা, জমি, কৃষক, গ্রামবাসী নিয়ে অন্য একটি গতিশীলতায় অবগাহন করে ছবি তৈরি করেছেন, যেখানে এক ধরনের গীতলতাও প্রণিধানযোগ্য। মোহাম্মদ ইকবাল বেছে নিয়েছেন দেশের সংসার-বিবাগী সূফীধর্মী আউল-বাউল-সন্ন্যাসীদের জীবনাচরণ দিয়ে ছবি নির্মাণ। নিরেট বাস্তবতাসমৃদ্ধ মনুষ্য বা জীবজন্তু বা বস্তুর অবয়বী ছবিগুলোতে উজ্জ্বল রং প্রাধান্য পেয়েছে এবং পটভূমি বুনোটী বিমূর্ততায় পরিস্ফুট। রোকেয়া সুলতানার ছেলেবেলা, পুতুল, স্মৃতিভারাতুর মন-খারাপিয়া যে-দিন ফেলে আসা হয়েছে, যা সবার জীবনেই ঘটেছে, সেইসব অনুষঙ্গ নিয়ে সরল নিষ্পাপ সংবেদী চিত্ররচনায় তিনি সিদ্ধহস্ত। বিপরীতে লায়লা নাজলী মনসুরের ছবি মধ্যবিত্ত সাংসারিক মানুষের শহরকেন্দ্রিক জীবনযাপন, রিকশা ভ্রমণ, বাড়ির ছাদে ফুলের টব, মেয়েদের রোমাঞ্চ পাশের বাড়ির কারো সঙ্গে, ঘিঞ্জি বসবাসের দৃশ্য, ধর্ষণ দৃশ্য– সব সরল-সোজাসুজি আধা-বিমূর্ততায় উপস্থাপিত হয়। আর একটি ধারা যেটি সামাজিক অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ছবি যা ব্যঙ্গধর্মী, কৌতুকাশ্রয়ী এবং সরাসরি সমাজের ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের নষ্ট ইচ্ছার নষ্ট সময়ের প্রতিবেদন, যা রেখায় কার্টুনে বিমূর্তিত হয়। শিশির কালো বা একক - প্রধান হলেও ঢালী আল মামুন রং-প্রধান, দিলারা বেগম জলিও তাই। এদের ছবিগুলোকে লোকজতা-নির্ভর বলা যায় কিন্তু গ্রাম-কেন্দ্রিক নয় বরং বলা যায় নাগরিক বা শহরকেন্দ্রিক। কেননা এই জীবনযাপন ও লোকায়তের অধীনে এইভাবে আরো অনেক শিল্পীর শিল্পকর্ম দ্বারা দেশের লোকজ ধারার সঙ্গে আধুনিক ধারার মেলবন্ধন প্রমাণ করা যায় যা প্রথম ধারা থেকে উৎসারিত। বাংলার লোকজ শিল্প তাই যুগে যুগে সব সময় সব শিল্পের অফুরন্ত আধার ও উৎস হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতের শিল্পীদেরও এই উৎসের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। ❑

লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য : প্রসঙ্গ পুতুল নাচ

ড. বিশ্বনাথ সরকার

আমরা সাধারণত ইংরেজি 'কালচার'-এর প্রতিশব্দ বলতে বুঝে থাকি 'কৃষ্টি' এবং সংস্কৃতি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালচারের প্রতিশব্দ কৃষ্টি ব্যবহার করতে শুরু করেন। পরে আচর্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এর প্রতিশব্দ 'সংস্কৃতি' তাঁর গোচরে আনলে তিনি নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করেন। এখন কৃষ্টির ব্যবহার তেমন নেই। সাংস্কৃতিক শব্দটিই বর্তমানে প্রচলিত। আমাদের মাঝে তখন থেকে 'ফোক কালচার' এর প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায় 'লোকসংস্কৃতি'। 'ফোকলোর' এর প্রতিশব্দ হিসেবে অনেক ফোকলোরবিদ 'লোকসংস্কৃতি' ব্যবহার করতে আগ্রহী। আবার কারো কারো মতে 'ফোকলোর' এর প্রতিশব্দ 'লোকঐতিহ্য'। প্রকৃতপক্ষে 'ফোকলোর' লোকসংস্কৃতিরই একটি অংশ মাত্র, সবটা নয়। আবার লোকঐতিহ্য ফোকলোরের একটি বৈশিষ্ট্য মাত্র।

যা হোক, তবু বাংলায় ফোকলোর অর্থে লোকসংস্কৃতিই সাধারণত ব্যবহার হতে দেখি। লোক বিজ্ঞানী এবং বিশেষজ্ঞদের মতে, লোকসংস্কৃতি তথা সংস্কৃতি জীবন সম্পৃক্ত, বস্তুসংলগ্ন এবং মানসসম্ভূত। জীবনসম্পৃক্ত বিষয়গুলো হলো আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান, ধর্মকর্ম, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ, শিক্ষাদীক্ষা, খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি। বস্তুসংলগ্ন মানস ফল বা বিষয়াবলী হচ্ছে ঘরবাড়ি, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র, যানবাহন, যন্ত্রপাতি, বস্ত্র-অলঙ্কার প্রভৃতি এবং মানসফলগুলো হলো সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা, পুতুল নাচ, মূর্তি, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি (ওয়াকিল আহম্মদ : বাংলার লোকসংস্কৃতি, ১৩৮১, পৃষ্ঠা ২-৩১।

পুতুল নাচ লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের একটি বিশেষ নিদর্শন, মেলা ও উৎসবে পুতুল নাচ শিশু কিশোরসহ সকল স্তরের মানুষের নিকট উপভোগ্য হয়ে উঠে। পুতুল নাচ সম্পর্কিত বিষয়টি উপভোগ্য হলেও এ বিষয়ে খুব একটা লেখালেখি হয়নি। এ বিষয়টি নিয়ে প্রথমে এগিয়ে আসেন এদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার প্রয়াত সেলিম-আল-দীন। পুতুল নাচকে তিনি পিএইচডি গবেষণা ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং তার তত্ত্বাবধানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব রশীদ হারুন পিএইচডি গবেষণার কাজ শুরু করেন। যতটুকু জানা গেছে তিনি ইতোমধ্যে এ বিষয়ে পিএইচডি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও পুতুল নাচের বিষয়ে অধিকতর গবেষণা ও উন্নয়নের প্রয়োজনে সেলিম আল-দীন এর আন্তরিক প্রচেষ্টায় একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম "বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র (Traditional Puppetry Research and Development Centre of Bangladesh) সেলিম আল-দীনের সাথে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করার কাজে সার্বিক সহযোগিতা করেছি, বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা ও উন্নয়ন কাজ চালিয়ে যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

পুতুল নাচ সম্পর্কে Bread and Puppet Theatre-এর প্রাণপুরুষ ও প্রখ্যাত পুতুল নাচিয়েদের অন্যতম আমেরিকার পিটার সুম্যান এমন অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আজকের আধুনিক অভিনয়শিল্প মূলত পুতুলনাচ থেকেই অস্তিত্ব লাভ করে থাকবে। বাংলাদেশের পুতুল নাচ বিশেষজ্ঞ মুস্তাফা মনোয়ারসহ অন্যদের বিশ্বাস, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে দেবদেবীর কৃতিত্বপূর্ণ কাহিনী ভক্তবৃন্দের সামনে প্রচারের উদ্দেশ্যে নিস্পন্দ প্রতিমায় গতিসঞ্চারের প্রচেষ্টার মাধ্যমে পুতুল নাচের জন্ম। সুকুমার সেন এবং স্বল্প কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত মনে করেন যে, ভারতীয় ধ্রুপদী সংস্কৃত নাট্যকলা অন্তত আংশিকভাবে হলেও পুতুলনৃত্যকলা থেকে উদ্ভব লাভ করেছে। সুকুমার সেন আরো মনে করেন, কালীদাসের সময়ে তাঁর সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞান শকুন্তল, বিক্রমোর্বশ ও মালবিকাগ্নি মিত্রের কিছু অংশ অভিনীত হয়েছিল পুতুলের সাহায্য নিয়েই। অধিকন্তু তাঁর মতে, সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ে প্রযোক্তা পার্টিতে শুধু তিন ব্যক্তিরই উল্লেখ থাকে। সূত্রধার– যে পুতুলের সুতো টানত (অথবা স্থাপক যে পুতুল নাচের ব্যবস্থা করত), পারিপার্শ্বিক (বা পার্শ্বক) যে সুত্রধারের পার্শ্বচারী ও সাহায্যকারী এবং পুরুষের পাঠ বলত আর নটী যে মেয়ের পাঠ বলত এবং দরকার হলে নাচত। এই তিনটি নিয়ে ছিল আদিতে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের দল। প্রয়োজন হলে বা উপযুক্ত পাত্রপাত্রী পেলে যে তাদের পাঠ দেয়া হতো না তা নয় কিন্তু তার উল্লেখ বেশি পাওয়া যায়নি। পুরোপুরি নটনটীদের নিয়ে অভিনয় হতো অবশ্যই, কিন্তু তা নির্ভর করত নাট্যের বিষয় ও প্রকৃতির উপর। (সুকুমার সেন, নটনাট্য নাটক, কলকাতা, ১৩৭২, পৃ. ৯৮-৯৯)

ভারতীয় পুতুলনাচের সবচেয়ে পুরনো ও সবচেয়ে জনপ্রিয় রীতিকাঠামো হচ্ছে 'সূত্রপুতুল' (String Puppet) আর বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে, এর উদ্ভব ঘটেছে কমপক্ষে তিন হাজার বছর আগে। অনুরূপভাবে 'সূত্রপুতুল' রীতির পুতুলনাচ বাংলাদেশেও সর্বাধিক জনপ্রিয়। ধারণা করা হয় অন্তত আটশো বছর আগে অভিনয় শিল্পের এক প্রভাবশালী রীতিকাঠামো হিসেবে এই অঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন ছিল।

বাংলায় 'সূত্রপুতুলরীতি'র পুতুলনাচের জন্য সচরাচর যে ধরনের সূত্রপুতুল ব্যবহৃত হয় সেসব ১০" থেকে ১৮" উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এসব পুতুল কোমরের উর্দ্ধাংশে বাঁধা দুই অথবা তিনটি সুতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এগুলোর কোমরের নিম্নাংশ এমনভাবে কাপড় দিয়ে ঢাকা থাকে যে তাতে পদযুগলই শুধু দেখা যায়। যেসব উপকরণ সহযোগে পুতুলগুলো তৈরি করা হয় তা হচ্ছে ধানের তুষ, নলখাগড়ার মন্ড, কাপড় ও ভাত থেকে বানানো এক ধরনের আঠা। কখনো পুতুলের মূল কাঠামোটি কাঠ দিয়েও তৈরি করা হয় এবং সেক্ষেত্রে কাঠামোর গায়ে তুষ ও কাদার মিশ্রণ লেপে দিয়েতার উপর কাপড়ের আবরণ সেঁটে দেয়া

হয়। দেখা গেছে, ঐতিহ্যগত ভাবে দ্বি-চরিত্রবিশিষ্ট রাধা-কৃষ্ণ অনুষ্ঠান উপযোগী কাঠামোটিই পুতুলনাচের ক্ষেত্রে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

বাংলাদেশের এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মুস্তাফা মনোয়ার মনে করেন, বাংলাদেশে দণ্ড দ্বারা পরিচালিত পুতুল নির্মাণের ইতিহাস কমপক্ষে পাঁচ থেকে ছয়শো বছরের পুরনো। সচরাচর বড় মেলা উৎসবে আগত দর্শণার্থী কর্তৃক পছন্দকৃত যেসব 'দণ্ড পুতুল' (Rod Puppet) দৃশ্যগোচর হয় তার আকার 'সূত্রপুতুল' থেকে বেশ বড় হয়ে থাকে। এদের উচ্চতা তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত হতে পারে। একজন পুতুল-নাচিয়ে এ জাতীয় একটি পুতুলই কেবল নাচাতে পারেন এবং শুধু দু'রকমভাবে পুতুলগুলোকে নাচানো সম্ভব– প্রথমত এদের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং দ্বিতীয়ত দুই হাতের ওঠানামার মাধ্যমে। এছাড়া কোমর কিংবা নিম্নাঙ্গের কোনরকম সঞ্চালন এসব পুতুলের পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে কখনো দ পুতুলের উদ্ভব বা প্রসার ঘটে নি, পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়াতেই কেবল এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। শুধুমাত্র পুতুল নাচের অপর দুইরূপ 'দস্তানা পুতুল' (Glove Puppet) ও 'ছায়া পুতুল' (Shadow Puppet) পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশে প্রচলিত নয়। মনে করা হয়ে থাকে যে, আজ থেকে সত্তর বছর আগে পশ্চিমবঙ্গে 'দস্তানা পুতুল' তৈরির রীতির প্রচলন ঘটে। সুকুমার সেনের মতানুযায়ী জাভার বিখ্যাত 'ছায়াপুতুল' প্রকৃতপক্ষে এর উৎপত্তির জন্য প্রাচীন ভারতবর্ষের কাছেই ঋণী।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া বাংলাদেশের পুতুলনাচের 'প্রাণকেন্দ্র'। অনেকে মনে করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার কৃষ্ণনগর গ্রামের বিপিন পাল ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম পুতুলনাচ প্রচলন করেন। চারুই গ্রামের অপর পুতুল নাচ শিল্পী গিরীশ আচার্য, মোঃ তারু মিয়া প্রমুখের উদ্যোগে কয়েকটি দল তৈরির মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পুতুলনাট্যের বিকাশ ঘটে এবং পুতুলনাট্য শিল্পী ধন মিয়ার মাধ্যমে তা জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশের অভিমত পুতুলনাট্যের, বিশেষত সুতা পুতুলের আদিভূমি ভারতবর্ষ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনায় পুতুলনাট্য প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের এ শিল্প মাধ্যমের প্রাচীন লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যে পুতুলনাচ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হই। বিভিন্ন মনীষীদের রচনা ও স্মৃতিকথায় অখণ্ড বাংলার নানা অংশে মেলা ও উৎসবে পুতুল নাচ প্রদর্শিত হবার নানা তথ্যও পাওয়া যায়। তথাপি এই পুতুল নাচ শিল্পের ইতিহাস ও তথ্য নিয়ে রয়েছে বিস্তর বিভ্রান্তি। এর অন্যতম কারণ এই শিল্প মাধ্যমটি অদ্যাবধি অনুসন্ধিৎসু গবেষক লেখক বা শিল্প সংস্কৃতির ইতিহাস রচনাকারদের সমীহ আদায় করতে পারে নি। 'হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি' পরিচয়ের বিপুল আয়তনের গ্রন্থ রচিত হলেও সেখানে পুতুলনাচ বা পুতুলনাট্য স্থান পায় নি। এমন কি বিভিন্ন জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিষয়ক গ্রন্থে (যেমন– রাজশাহীর ইতিহাস; খুলনা-সাতক্ষীরা-যশোর-বরিশাল জেলার ইতিহাস গ্রন্থসমূহ; ঐতিহ্যবাহী ঝিনাইদহ; দিনাজপুর : ইতিহাস ও ঐতিহ্য; সিলেট: ইতিহাস ও ঐতিহ্য; পাবনার ইতিহাস; ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা: ইতিহাস ও ঐতিহ্য প্রভৃতি)। দু'একটিতে মাটির পুতুল প্রসঙ্গ এক-আধটুকু লেখা থাকলেও কোথাও পুতুলনাচ বা পুতুলনাট্য বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়নি। লোকসংস্কৃতির অন্যতম ঐতিহ্য হিসেবে এ বিষয়ে গবেষণা এবং বিস্তারে এগিয়ে না আসলে অচিরেই লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুতুলনাচ শিল্প মাধ্যমটি বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশে বর্তমানে যে সকল পুতুল নাচ দল বা শিল্পী রয়েছেন তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত কিছু সমস্যার কারণেই লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য পুতুল নাচ ব্যাপকভাবে প্রসারে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পুতুলনাচের সাথে সংশ্লিষ্ট দলসমূহের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনা ও এ শিল্পের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের অভিমত সংগ্রহপূর্বক কতিপয় সমস্যা

১. পুতুল নাচের সাথে যারা সম্পৃক্ত তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় তারা কেহই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেননি, নিতান্ত শখের বশবর্তী হয়ে পুতুলনাচ দেখে পুতুলনাচ দল তৈরীতে আগ্রহী হয়েছেন। অনেকে সামান্য পড়াশোনা জানা আবার অনেকে একেবারেই পড়ালেখা জানেন না।

২. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বা অক্ষরজ্ঞান না থাকার দরুণ এ শিল্পী-রা প্রয়োজনীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা বিবিধ শিল্প ও শিল্পচিন্তার সাথে পরিচিত হতে পারে নি। ফলে আধুনিক সময়ের সাথে পুতুল নাচ শিল্প-চিন্তা কাল-উপযোগী হয়ে উঠতে পারে নি।

৩. এই শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ জনই শ্রেণীগত বিচারে একেবারেই প্রান্তিক। দেশ বিভাগের পূর্বে পুতুলনাচের সাথে জড়িত সকলেই ছিলেন নিম্নবর্ণের হিন্দু জাতি-গোষ্ঠীর। দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে এই শিল্পের প্রায় সকলেই চলে যান পশ্চিমবঙ্গে, ফলে সৃষ্টি হয় শূন্যতা।

৪. অন্যান্য শিল্পের ন্যায় পুতুলনাচেরও উদ্ভব ঘটে 'কৃত্যে'র আশ্রয়ে। সূচনা থেকেই পুতুলনাচের পরিবেশনার বিষয়বস্তু ছিল রামায়ণ, মহাভারত, রাধা-কৃষ্ণ, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি। অখণ্ড বাংলায় এ সকল বিষয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আদৃত ও জনপ্রিয় হলেও দেশ ভাগের পর এই অঞ্চলের ধর্মীয় চেতনা ও জনরুচির পরিবর্তনের ফলে উক্ত বিষয়সমূহ দর্শক-আগ্রহ হারাতে থাকে। অথচ যারা এ শিল্পে সম্পৃক্ত আছেন, তাদের মধ্যে সময়-উপযোগী বিষয় সন্নিবেশ ঘটানোর ক্ষমতা নেই। ফলে ক্রমেই এ শিল্পের দর্শক প্রিয়তা কমতে থাকে।

৫. ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর বাংলাদেশের পূর্ব বঙ্গে মুসলিম পুতুল নাচিয়ের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে চলে যাওয়া পুতুলনাচ দলের দিন ভিত্তিক কর্মী ছিল। চলে যাওয়া দলের কাছ থেকে প্রাপ্ত পুতুল ও গল্পসমূহ অথবা পূর্বতন দলে কাজের অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে এদেশের মুসলিম শিল্পীদের পুতুলনাচ। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুতুলসমূহ কিংবা অন্ধ অনুকরণে তৈরি পুতুল, নামে মাত্র সাজ পোশাকের

পরিবর্তন এবং দুর্বল গল্প-চয়ন এ শিল্পকে নতুন কোনো মাত্রা দিতে পারেনি। রাম-সীতার স্থলে রূপবান, রাধা-কৃষ্ণের স্থলে আলোমতি বা ভানুমতি, বেহুলা-লক্ষিণদরের পরিবর্তে বেদে-বেদেনির গল্প কিংবা মামুলি মাছ ধরা, বাঘ শিকার অথবা জনপ্রিয় যাত্রা বা সিনেমার গল্প-গান প্রভৃতি সাময়িক আবেদন সৃষ্টি করলেও কোনো পুতুলনাচে নান্দনিক বোধ তৈরি করতে পারে নি।

৬. উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পুতুলসমূহ (যাদের বয়স ৫০-৬০ বৎসর হয়েছে) অথবা ঐ সকল পুতুলের অনুকরণে নির্মিত পুতুলসমূহ দেব-দেবীর আদলে তৈরি। মূলত দেব-দেবী প্রস্তুতকারীদের দিয়ে পুতুলের মুখমণ্ডল ও উর্ধ্বাংশ নির্মিত হয় বিধায় পুতুলগুলি প্রচলিত রাম-কৃষ্ণ, রাবণ, লক্ষণ-কার্তিক-সীতা-রাধা প্রভৃতির প্রচলিত অবয়বেই নির্মিত হয়। তাই দেখা যায় কৃষক পুতুল আর রাজা পুতুলের চেহারা রঙ রেখা একই। কিংবা রাধা-সীতার সাথে বৈষ্ণবী-কিষাণীর কোনো অমিল থাকে না। দৃশ্যত এই অ-বিভাজ্য রঙ-রেখা-চরিত্র দর্শককে কৌতুহলী বা ঔৎসুক্য করে তোলে না। একই অঞ্চলের সকল দলের পুতুল-গল্প-গান-উপস্থাপনা অভিন্ন এবং ৩০-৪০ বৎবর যাবৎ একই, ফলে ধীরে ধীরে এই শিল্প-দর্শনে দর্শকবিমুখ হয়ে পড়ছে।

৭. মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে বিদ্যমান দলগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নিজ দল বা অঞ্চলের পুতুলনাট্য ছাড়া আর কোনো দলের খবর বা অধিকাংশ পুতুলনাট্যের রীতি সম্পর্কে কিছুই জানে না। অধিকাংশ দলের পরিচালক, পুতুল মাস্টার কিংবা পুতুল নাচিয়ে নিজেকেই শ্রেষ্ঠ পুতুল শিল্পী এবং নিজের দলই সেরা বলে মনে করেন। এই কূপমণ্ডুকতাও এ দেশের পুতুলনাট্য শিল্প বিকাশের অন্যতম অন্তরায়।

৮. পরিবেশনা, মঞ্চ বিন্যাস, চিত্র রচনা, আলোক প্রক্ষেপণ প্রভৃতি জরুরি বিষয়েও কোনো প্রকার গুরুত্ব প্রদান লক্ষ্য করা যায় না। দর্শক বৈচিত্র্যহীন, শিল্প-মান শূন্য প্রদর্শনীতি আসতে অনাগ্রহী হয়ে পড়বে।

আমাদের ধারণা, উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আরও অনেক বিষয় নজরে পড়বে আগ্রহী ও উৎসুক্য গুণীনদের। আমরা বর্তমানে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাচ গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের পক্ষ থেকে চেষ্টা করছি ঐতিহ্যবাহী অথচ সমৃদ্ধ এই শিল্প মাধ্যমটি নিতান্ত অবহেলা বা অবজ্ঞায় হারিয়ে না যাক। শিশুর মানস গঠনে, নাগরিক সচেতনতা ও উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও চিকিৎসা, মনোচিকিৎসা, প্রচার প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে পুতুলনাচের অপার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক দেশে যে সমৃদ্ধি এসেছে বাংলাদেশেও একইভাবে সমৃদ্ধি আনা সম্ভব। স্বল্প পরিসরে হলেও টেলিভিশনে গান শিক্ষা, চিত্র অঙ্কন, অক্ষর পরিচয় কিংবা পরিবেশ সচেতনতায় পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত 'পাপেট' ইতোমধ্যে যে সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করেছে তা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। এছাড়া জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বাল্য-বিবাহ, যৌতুক বিরোধী কার্যক্রম, স্বাস্থ্য সচেতনতা, কুষ্ঠ নিরাময়, টীকাদান কর্মসূচি, জন্ম নিবন্ধণকরণ কর্মসূচি প্রভৃতির যেসকল ক্ষেত্রে ঐতিহ্যবাহী পুতুলনাট্যের শৈলী প্রযুক্ত হয়েছে তার সুফল ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা ও দীর্ঘ মেয়াদি কর্ম-পরিকল্পনা, দিকনির্দেশনা পুতুলনাচ শিল্পী বা দলকে দেয়া হলে এই শিল্পকে হৃত গৌরব শুধু ফিরিয়ে দেবে না, উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করে তুলবে এই জনপদের হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর উদ্যোগে গত ২০-২৩ ..... পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বাছাইকৃত ১১টি দলের অংশগ্রহণে প্রদর্শনী করা হয়েছিল। এভাবে প্রতি বছর যদি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো তাহলে এ শিল্প মাধ্যমটি বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা পাবে। বর্তমানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র থেকে জরিপ চালিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪০-৪৫ টি পুতুল নাচ দলের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ যুগ উপযোগী কাহিনী সমৃদ্ধ করণের কাজে প্রতিষ্ঠানটি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আর্থিক সহায়তা পেলে এই বিলুপ্ত প্রায় লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী পুতুল নাচ শিল্পটি বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। অন্যথায় লোক সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুতুল নাচ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ❑

তথ্যসূত্র :

১. তোফায়েল আহমেদ, লোকশিল্প, বাংলা একাডেমী-১৯৮৬।

২. সৈয়দ মাহবুব আলম, পুতুলনাচ-১৯৮৯।

৩. ওয়াকিল আহমেদ, বাংলার লোক সংস্কৃতি ১৩৩১ পৃষ্ঠা, ২-৩১।

৪. মোহিত রায়, লোকনাট্য-লোকনৃত্য (প্রবন্ধ), জেলা লোকসাংস্কৃতিক পরিচয় গ্রন্থ: নদিয়া, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, মার্চ ২০০৩, পৃষ্ঠা ১১২।

৫. সুশান্ত হালদার, বাংলার পুতুলনাচ (প্রবন্ধ); সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ, সম্পাদনা মালিনী ভট্টাচার্য, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ২২০-২২১।

৬. চিন্ময় দাশ, পুতুলনাচ (প্রবন্ধ); জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, মেদিনীপুর; লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা ৩৩২।

৭. মো. ইব্রাহিম খান সাদাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঐতিহ্য নিদর্শন (প্রবন্ধ), কালোত্তর ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সম্পাদনা মনসুর কামাল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেসক্লাব, জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা-১২৮-২৯।

সোনারগাঁওয়ের মেলা ও লোকজ উৎসবের স্বরূপ সন্ধানে

শামসুদ্দোহা চৌধুরী

স্বজাতির বিন্যাস, চারিত্রিক ধরন, জন্ম বৃত্তান্ত, আত্মোপলব্ধি, ভৌগোলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও নিসর্গের অবস্থান, হৃদয়ের পুঞ্জিভূত উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ যদি মেলার মাধ্যমে হয়ে থাকে তবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই, বিশ্বের প্রতিটি স্তরে দৃশ্য-অদৃশ্যমান জনজীবনের মেলা তো অহরহই হচ্ছে। প্রাত্যহিক জীবনের ধ্যানধারণায় জন্ম হয় স্ব-স্ব জাতির নিজস্ব লোকাচার এবং এই লোকাচার, লোকসংস্কৃতি থেকে যদি একটি জাতির জাতীয় উৎসবের উৎস হয়। তবে একথা বলা যায়, বিশাল জাগতিক ভুবনে ঋতু বৈচিত্র্যের অহর্নিশি লীলাখেলায় চৈত্র-বৈশাখের রুদ্র দহনের মাতম তাণ্ডবে কাঠফাটা জমিনে একপশলা বারি বর্ষণে নিষ্ফলা জমিনে হয়ে যায় যেমন ঘাসের উৎসব, ঠিক তেমনি শ্রাবণের অঝোর ধারার বারি বর্ষণে মরা নদীতে হয়ে যায় নতুন পানি ও মাছের উৎসব। উৎসবের দু'একটি দৃষ্টান্ত তো এমনি।

সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক উৎসবের প্যাটার্ন এক সূত্রে গাঁথা বলে লোক গবেষকরা উল্লেখ করলেও এই যৌথ কর্মকাণ্ডের মাঝে একটি কথার ফারাক থেকে যায়। সংস্কৃতি কথার অর্থ যদি হয় সংস্কার তবে সাংস্কৃতিক উৎসবের উদাহরণে উঠে আসা সংস্কারের মাধ্যমে কোনো জাতির শুদ্ধ সংস্কৃতির লালন-পালনের মডেল উপস্থাপন করা। আপন মনের মাধুরি মেশানো এই লোকজ উৎসবে জাতির ঐতিহ্যমাখা দৃষ্টি তো থাকবেই। এই শুদ্ধ সংস্কৃতির দর্শন আমরা মুখে মুখে পালন করলেও প্রাত্যহিক জীবন দর্শনে এটির প্রভাব ক্রমশই দ্রুত সরে যাচ্ছে। শেকড় নিয়ে আমরা যতই মুণ্ডুপাত করি না কেন শেকড় সন্ধানী মানুষ এ সংসারে ক'জনাই বা আছে। এর পরও রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত উক্তিতে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষমঙ্গল উৎসবে বলেছিলেন– 'বৃক্ষ নিধনের কষ্টের দহনকে আমরা বৃক্ষ রোপণ উৎসবের আনন্দেই ভুলতে পারি'। সেই অতৃপ্ত দহন, আনন্দ-বিরহের লোকসংস্কৃতিতে আমরা একাকার, লীন হয়ে যাই লোকমেলায় ও লোকজ উৎসবের বিভিন্ন প্যাটার্নে। মোদ্দাকথা হল সংস্কৃতির শুদ্ধ চর্চা শুধু কথামালায় ব্যাপৃত রাখলে চলবে না, তা আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন সংগ্রামেও প্রতিফলন ঘটাতে হবে। লোকমেলা ও লোকজ উৎসব শুধু নিছক আনন্দ ও উপভোগের ফসল নয়, লোকমেলা বাঙালির জীবন সংগ্রামেরও একটি জীবন্ত দলিল। বাঙালির ঘামে, মনন-মেধায়, মিশে থাকা শৈল্পিক ধারা উৎসারিত হচ্ছে আবহমানকাল ধরে লোকজ উৎসব ও লোকজ মেলার মাধ্যমে। চতুর্দশ শতকের চারু ও কারুকলার স্মৃতি বিজড়িত বাংলার মধ্যযুগের রাজধানী সোনারগাঁওয়ে লোকজ মেলা ও লোকজ উৎসবের ধরন-ধারণ কেমন ছিল তা বলা না গেলেও সুবর্ণ গ্রামের বৌদ্ধ হিন্দু রাজাদের আমলে বা তারও হাজার বছর আগে পূজা-পার্বণে যে লোক মেলা ও লোকজ উৎসব জমে উঠতো তা তো কিছু ঐতিহাসিক সূত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায়। নদীভিত্তিক লোকাচার জীবনযুদ্ধে ধর্ম এসেছে উৎসবের বাণী নিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সোনারগাঁওয়ের পুরাণের এক ঐতিহ্যবাহী উৎসব হলো স্নানের উৎসব। কালিকাপুরাণের বর্ণনা মতে, লাঙ্গলবন্দের স্নান উৎসব এবং এই স্নান উৎসবকে ঘিরে ইতিহাসখ্যাত লোকজ মেলার বয়স পেরিয়ে গেছে দেড় হাজার বছরেরও অধিককাল। সাম্প্রতিক সময়ে পানামের ধ্বংসপ্রায় ইমারত স্থাপত্যের নান্দনিক কারিশমায় এক সময় যে জমিদার-তালুকদার শ্রেণী এবং মধ্যস্বত্বভোগীর বিত্ত-বৈভব এবং তাদের প্রাসাদোপম গৃহের আঙিনায় ও অন্দরমহলে লোকজ উৎসবের ঘরোয়া আয়োজনের ব্যাপার ছিল এবং সেই উৎসবে সে সময়কার জমিদারদের আভিজাত্যেরই এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ ছিল তা তো পানামের ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদগুলোর স্থাপত্যকলা দেখলেই বোঝা যায়। সোনারগাঁওয়ে আদি মধ্যযুগে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলাম প্রচারক ও দরবেশদের খানকাহ শরীফগুলো হয়ে ওঠে লৌকিক জীবনাচারের এক সমৃদ্ধ কেন্দ্র। কালক্রমে এ সমস্ত দরগায় বছরের কোনো এক সময়ে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক মিলনমেলা হয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল মোগরাপাড়া দরগাহ শরীফ। প্রতি বছর মাঘ মাসের ১২ তারিখে এখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে লোকজ মেলা হয়ে থাকে। যা এখনও মহাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ওরসের মাধ্যমে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এই বিকাশমান ধারা উজ্জীবিত হয়েছিল সোনারগাঁওয়ের বিখ্যাত কারু ও চারুশিল্পের উৎপাদন ও বিপণনের জন্য। ইতিহাসখ্যাত মসলিন কাপড়, কাঠের চিত্রিত হাতি, ঘোড়া, নান্দনিক মৃৎশিল্প, ঝিনুক অলংকৃত দারুশিল্পের কাজের জন্য এ বিখ্যাত নগরীর নিশ্চিত প্রয়োজন হয়েছিল এক্সিবিশন বা প্রদর্শনী করার। সে এক্সিবিশনটা ছিল যদিও নগরের নাগরিক সম্প্রদায়ের মেলা, সে মেলাগুলোই ছিল মূলত সোনারগাঁওয়ের আদি মধ্যযুগের মেলা। সে মেলাগুলোই পরবর্তীকালে বিদেশে রপ্তানিযোগ্য কাপড়ের এক সমৃদ্ধ মেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল– এ কথা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। কালের বয়স পেরিয়ে চারু ও কারুশিল্পের বহমান ধারা নির্জীব হলেও সোনারগাঁওয়ের দু'একটি শিল্প পরিবার কাঠ, বাঁশ, বেতের কাজটিকে বংশপরম্পরায় চালিয়ে আসছে। যদিও সে ধারাটির মূল শেকড়টাই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে, তথাপি লোকজ

এ নান্দনিক কর্মটি এখনও এক সুমহান ঐতিহ্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বিস্মৃতপ্রায় আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতির সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। শিল্পাচার্য শুরুতে যে কাজটি করতে চেয়েছিলেন এবং যে কারণে তিনি চতুর্দশ শতকের রাজধানী সোনারগাঁওয়ের পানে পা বাড়িয়েছিলেন, তার মূল কারণ ছিল সোনারগাঁওয়ের জাদুঘর স্থাপনার সীমানা ঘেঁষা এক লোকজ মেলায় আবহমান বাংলার এক উন্মুক্ত মেলা দেখে। গাঁয়ের ইতল বিতল পথ পেরিয়ে কলাপাতা বাঁশির পোঁ পোঁ শব্দে বিভোল কিশোর, মাটির কলসি ভরা বিন্নি ধানের খই, উখরা, মুড়ি-মুড়কি, জিলিপি নিয়ে পল্লী বধূর গাঁয়ে ফেরা, মেলায় কাঠ, বাঁশ, বেত, শোলার বিভিন্ন কাজের মনোমুগ্ধকর সমাহার, ওপেন্টি বায়োস্কোপ, ঝুমুর ঝুমুর পুতুল নাচ, লোকজ মেলায় বয়াতিদের মরমি গান শিল্পাচার্যকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। শুধু কী তাই সোনারগাঁওয়ের পাগলা গাছতলা, বটতলা, উদ্ধবগঞ্জের বৌখেলা এবং পয়লা বৈশাখের বৈশাখী মেলা শিল্পাচার্যের পরানের গহিনে দোলা দিয়েছিল। সোনারগাঁওয়ের বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলোর স্বরূপ অন্বেষায় নিজ মন-মেধাকে সঙ্গ দিয়েছিলেন পরিপূর্ণভাবেই। লোকজ গবেষকরা ধারণা করেন, শিল্পাচার্যের লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন সৃষ্টির মূলে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কারণের পাশাপাশি এই কারণটিও যোগ হয়েছিল।

১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশন লোকজ ঐতিহ্য উপাদান সংগ্রহের পাশাপাশি বৈশাখী মেলাও চালু করেছিল। এই বৈশাখী মেলা কালক্রমে এক বিশাল মহিরুহের মতো ডালপালা ছড়িয়ে নব্বই দশক থেকে ফি বছর মেলা করে আসছে। মেলার সার্বিক উদ্দেশ্য আবহমান বাংলার সংস্কৃতি ও নিত্যদিনের ঘর-সংসারির উপাদান, উপকরণ ও গ্রামীণ অর্থনীতির বহতা ধারাকে গতিশীল করার পাশাপাশি আমাদের শেকড়ের ঐতিহ্যকে প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়া। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বদৌলতে প্রতি বছরের এই শেকড়ের মেলার ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সীমানার বাইরেও। বিলুপ্ত ও লুপ্তপ্রায় শিল্পসম্ভারের পুনর্জাগরণ ও বিপণনের মহতী প্রচেষ্টার উদ্যোগ কিছুটা হলেও সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। গ্রামীণ বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য লোকায়ত খাবার-দাবার, পিঠা-পুলি, মিষ্টির বিশাল আয়োজন এই ফাউন্ডেশনের লোকজ মেলাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে আবহমান বাংলার হারিয়ে যাওয়া মেলার আমেজ। লোকজ সন্ধ্যায় জাদুঘর প্রাঙ্গণে ছনে ছাওয়া কুঁড়েঘরের লোকজ মঞ্চে জমে ওঠে বাংলার চিরায়ত লোকজ সঙ্গীতের আসর। জারি, সারি, ভাটিয়ালি, হাছন রাজা, লালন ফকিরের মরমি সঙ্গীতে বাঙালি ফিরে যায় লোকায়ত বাংলার শৈশব ও কৈশোরের সন্ধ্যায়। হাজারো জনতার পরানের গহিনে ডাক দিয়ে যায় সেই বটতলায়, নদীর তীরে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা মেলার নৌকাগুলোর নস্টালজিক স্মৃতির দিকে। যে স্মৃতির স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। উৎসের দিকে ফেরো বাঙালি, নিজ ভূমে হয়ো না পরবাসী। ❑

লোকজ ঐতিহ্য : পটচিত্র

একেএম মুজ্জাম্মিল হক

পৌরাণিক উপাখ্যান অথবা মুসলিম পীর ফকিরদের বিচিত্র কাহিনী কাপড়ের ওপর অঙ্কিত চিত্রকর্মই পটচিত্র। এ পটচিত্র বাংলার হাজার বছরের লোকশিল্পকলায় ঐতিহ্যিক উৎকর্ষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক শিল্প। বাঙালির নিজস্ব লোকসংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত এক বৃহৎ জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হতো প্রাচীন এ শিল্প মাধ্যম। ১২-১৯ শতাব্দী পর্যন্ত পটুয়ারা পটচিত্র নির্মাণে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন বলে জানা যায়।

সংস্কৃ শব্দ 'পট্ট' বা কাপড় শব্দ থেকে পট শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীনকালে যখন কোন আনুষ্ঠানিক শিল্পের ধারা গড়ে ওঠেনি তখন পটচিত্রকর্মই ছিল বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক। সাধারণত পটুয়া, পটিদার বা আচার্য– এই তিন নামে তারা সমাজে পরিচিত। একদিকে তারা চিত্রশিল্পী, অপরদিকে কবি ও গায়ক হিসেবেও সমাদৃত। বাংলার একান্ত নিজস্ব এ শিল্পকর্ম পটচিত্র দু'প্রকার; (ক) দীর্ঘ জড়ানো পট (খ) ক্ষুদ্রাকার চৌকাপট। জড়ানো পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা এবং ১-৩ ফুট চওড়া হয়ে থাকে। আর চৌকাপট সাধারণত ছোট আকারের হয়। এসব পট মূলত কাগজ বা মাড়যুক্ত কাপড়ের ওপর অঙ্কিত হয়।

পটচিত্র তৈরি পদ্ধতি : কাপড়ের ওপর কাদা, গোবর ও তেঁতুল-বীচির আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে জমিন তৈরি করা হয়। তারপর পটুয়ারা রঙতুলি দিয়ে তাতে চিত্র অঙ্কন করেন। এতে দেশজ রঙ, ইটের গুড়া, কাজল, লাল সিঁদুর, সাদাখড়ি, আলতা, কাঠকয়লা, নীল, হলুদ, গোলাপি, বাদামি ও কালো রঙ লাগিয়ে পাখির পালকের তুলির সাহায্যে অথবা কঞ্চির মাথায় পশুর লোম লাগিয়ে ছবি আঁকা হয়। পটচিত্রশিল্প অঙ্কন প্রথা একটি বংশানুক্রমিক পেশা। শিল্পীর উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যাওয়া শৈলী ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত রঙ, রেখার বিন্যাস এবং গতানুগতিক ধারা পটচিত্রকলায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এতে ধারাবাহিক কয়েকটি কাঠামোয় পটুয়ারা ছবি আঁকেন। এসব ছবির মধ্যে নানা ধরনের নীতি শিক্ষার বিষয় তুলে ধরা হয়। ফলে এর দর্শক শ্রোতারা পাপ ও পূণ্য সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে।

লোকপ্রিয় ধর্মীয়কাহিনী অবলম্বনে সাধারণত পটচিত্রে রাজা হরিসচন্দ্র কাহিনী, শ্রী বৎস রাজার কাহিনী, মহিষাসূরমর্দিনী, কমলে কাহিনী, বেহুলা-লখিন্দর, মনসা-চাঁদ সওদাগর, কৃষ্ণলীলা, দুর্গাপালা, লক্ষ্মী, অন্নপুর্ণা, চণ্ডি, দশাবতার, রামলীলা, কৈলাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা, শিব, পার্বতীলীলা, রামের বনবাস ইত্যাদি বিষয় অঙ্কিত হয়। এছাড়া গাজীর পটে গাজী কালু চম্পাবতীর কাহিনী ও গাজী পীরের বীরত্বব্যঞ্জক বিভিন্ন অলৌকিক কাহিনীও অঙ্কিত হয়। এতে গাজীকে কখনো বাঘের পিঠে সমাসীন, কখনো সুন্দরবনের রাজার সাথে লড়াই করতে, কখনো মাথায় টুপি বা রাজমুকুট, পরনে রঙিন পাজামা কিংবা ধুতি পরিহিত, একহাতে ত্রিকোণ পতাকা অন্যহাতে তলোয়ারসহ বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ছবি প্রদর্শিত হয়। একই সঙ্গে নানা কৌতুক, রঙ্গরস সংবলিত সামাজিক দূরাবস্থার কাহিনীও পটচিত্রে অঙ্কিত হতে দেখা যায়। এই পটুয়া সম্প্রদায়ের আদি উৎপত্তি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তবে পৌরাণিক কাহিনীতে বিশ্বরূপকার বিশ্বকর্মার ৯ ছেলে সম্পর্কে উল্লেখ আছে; 'নিচু জাতের এক রমণীর সঙ্গে বিশ্বকর্মার মিলনের ফলে ৯ সন্তানের জন্ম হয়। ওই ৯ সন্তান তথা নবসায়কের নিয়তি নির্ধারিত হয়– তাদের শারীরিক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে থাকতে হবে। পটচিত্রকরকে ওই ৯ সন্তানের কনিষ্ঠ সন্তান হিসেবে গণ্য করা হয়। অবশিষ্ট ৮ সন্তান পেশাগত অন্যান্য উপায়ে সামাজিকভাবে উন্নতি করলেও ৯ম চিত্রকর সন্তানটি তাতে ব্যর্থ হওয়ায় তার জন্মকালের ললাটলিপির বোঝাই তাকে বয়ে চলতে হয়'।

সামাজিক পর্যায়ে পটচিত্রকরদের অবস্থার উন্নতির জন্য তারা একযোগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তবে তাদের অনেকের মাঝে প্রতিমা পূজার রীতিও থেকে যায়। এজন্য তারা মুসলিম সমাজের মূলধারায় স্বীকৃত হয়নি। অনেক জায়গায় এরা সমাজে দ্বৈত পরিচয় দিয়ে থাকে। নিজ সম্প্রদায়ের কাছে কেউ কেউ মুসলিম আবার অনেকে হিন্দু নামেই পরিচিত। তথাপি প্রাচীনকাল থেকে সাধারণ মানুষের ধর্মতৃষ্ণা নিবারণ ও চিত্তবিনোদনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে পটচিত্রশিল্প সমাদৃত হয়ে আসছে। এ কারণে এদেশের অনেক গৃহে পটচিত্র সংরক্ষণ করাকে কল্যাণ এবং দৈবদুর্বিপাক থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় বলে মনে করা হয়। তাই এদেশের প্রবহমান পটচিত্রকে লোকজ ঐতিহ্যের শৈল্পিকবোধের স্বত:স্ফূর্ত, সক্রিয় শক্তি এবং স্বপ্রতিভ বৈশিষ্ট্যসূচক মূর্য়াল পেইন্টিংয়ের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়।

সুকৌশলে নির্মিত দুর্লভ ও কৌতূহলোদ্দীপক এবং লোকশিল্পের জনপ্রিয় মাধ্যম হিসেবে এটি এখনো মুন্সিগঞ্জ, খুলনা, ময়মন-সিংহ, কিশোরগঞ্জ, ঢাকা, ফরিদপুর, নরসিংদী ও রাজশাহী জেলার পটুয়া শিল্পীরা এ পেশায় আংশিক নিয়োজিত আছেন।

নগরায়নের ফলে বর্তমানে পটচিত্র শিল্পের ঐতিহ্য ক্ষীণ হয়ে আসছে। এদের বেশিরভাগ শিল্পীই এখন অন্য লাভজনক পেশায় নিজেদের নিয়োজনে আগ্রহী। হাজার বছর ধরে প্রবহমান এ শিল্পের মাধ্যমে আমাদের লোকজ ঐতিহ্যের ধারা প্রত্যক্ষ করা যায়। অবহেলিত এ শিল্পকে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে উৎসাহিত উজ্জীবিত করতে পারলে দেশের লোকজ ঐতিহ্য, লোকশিল্প ও লোকসংস্কৃতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। ❑

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিশু ও মহিলা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা বেগম রাশেদা কে চৌধূরী

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শরফুল আলম

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী স্মারকে স্বাক্ষর করছেন প্রধান অতিথি সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শরফুল আলম

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব ডাঃ মোঃ মাহাবুবুল আলম

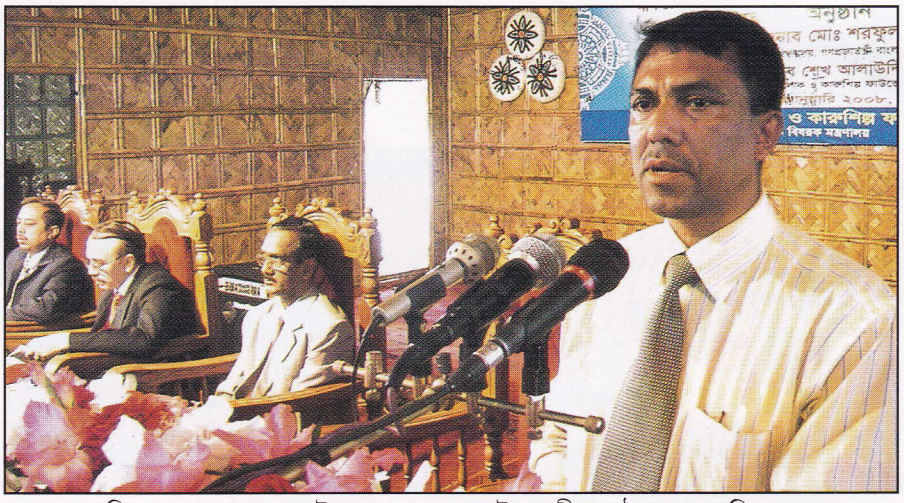

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক জনাব শেখ আলাউদ্দিন

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিনে ফাউন্ডেশনের বিনোদন/পিকনিক স্পট 'ঐতিহ্য'এর শুভ উদ্বোধন করছেন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মোঃ শরফুল আলম

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় আগত দর্শকদের একাংশ

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে মেলায় আগত বিদেশী পর্যটকগণের একাংশ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯৩তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন মিসেস জাহানারা আবেদিন

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠানে 'ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের নিরিখে সোনারগাঁ ও ঈসা খাঁর পরিচিতি' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করছেন ড. হাবিবা খাতুন

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠানে 'সোনারগাঁয়ের কারুশিল্প' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করছেন ড. জিনাত মাহরুখ বানু

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনার অনুষ্ঠানে 'বাংলাদেশের লোকশিল্প : অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করছেন ড. সাইফুদ্দীন চৌধূরী

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকসঙ্গীত পরিবেশন করছেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা শিল্পী সালমা

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করছেন ক্লোজআপ ওয়ান তারকা শিল্পী বাঁধন

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কিশোরগঞ্জ সাংস্কৃতিক একাডেমী (কিসাস) পরিবেশিত লোকজ গীতি নৃত্য নাট্য পরিবেশনের দৃশ্য

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বাউলগান পরিবেশন করছেন বাউল পাগল চান

মাসব্যাপী লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার লালন একাডেমীর শিল্পী আব্দুর রব লালন সঙ্গীত পরিবেশন করছেন

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত গ্রামীণ খেলার দৃশ্য

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত ঘুড়ি ওড়ানো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

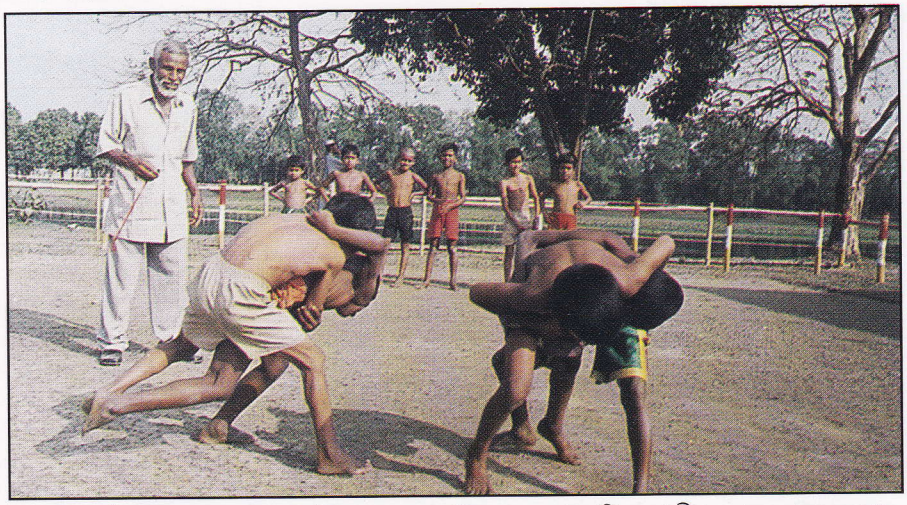

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত গ্রামীণ দোক খেলার দৃশ্য

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীতে চট্টগ্রামের তালপাতার হাতপাখা শিল্পী মোঃ আবুল কালাম

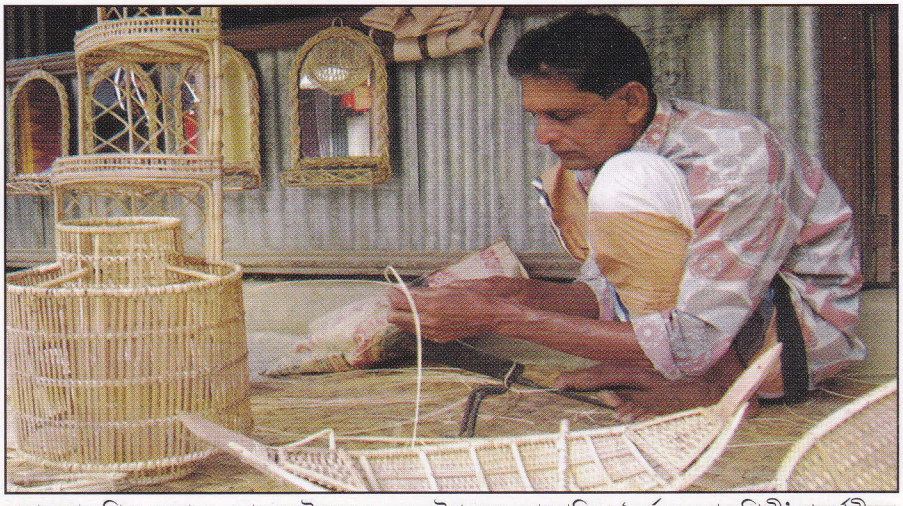

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীতে সোনারগাঁও এর বাঁশ-বেত শিল্পী পরেশ চন্দ্র দাস

লোককারুশিল্প মেলা ও লোকজ উৎসব ২০০৮ উপলক্ষে আয়োজিত 'কর্মরত কারুশিল্পী' প্রদর্শনীতে সোনারগাঁওয়ের ঐতিহ্যবাহী কাঠের চিত্রিত হাতি, ঘোড়া ও পুতুলের শিল্পী বীরেন্দ্র চন্দ্র দাস